এমিল ও গোয়েন্দা বাহিনী

এরিখ কাস্টনার

এমিল ও গোয়েন্দা বাহিনী

মূল
এরিখ কাস্টনার

জার্মান থেকে ইংরেজি অনুবাদ
এইলিন হল

এমিল ও গোয়েন্দা কাহিনী

মূল
এরিখ কাস্টনার

অনুবাদ
সুব্রত বড়ুয়া

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি
অন্তর্ভুক্তি নং:
বাস্তবায়নে : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
SEQAEP

অনুপম প্রকাশনী

প্রকাশনার তিন দশক

প্রকাশক
মিলন নাথ
অনুপম প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ ১৩৭৮ বাংলা
অনুপম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০০১
পুনর্মুদ্রণ
মে ২০০৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর ২০১২

©
অনুবাদক

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অঙ্গসজ্জা
ওয়ালটার ট্রায়ার

বর্ণবিন্যাস
বিল্লাল কম্পিউটার্স
৪৭/১ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য
১২০.০০ টাকা মাত্র

EMIL O GOYENDA BAHINI : Erich Castner
Bengali Edition Translated By Subrata Barua.
Published by Milan Nath. Anupam prakashani
38/4 Banglabazer Dhaka-1100
price Tk-120.00 US $ 5.00 Only

ISBN 978-984-404-356-5

ঘরে বসে বই পেতে অর্ডার করুন : ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১
অথবা লগ অন www.rokomari.com/ www.boi-mela.com

পরিমার্জিত সংস্করণ প্রসঙ্গে

চট্টগ্রামের সুখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বইঘর-এর স্বত্বাধিকারী সৈয়দ মোহাম্মদ শফি ১৯৭০ সালে একটি বই দিয়েছিলেন আমাকে অনুবাদ করার জন্যে। সেটিই *এমিল ও গোয়েন্দা বাহিনী* নামে তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। প্রকাশের পরপরই বইটি পাঠক মহলে দারুণভাবে সমাদৃত হয়। তবে এর পেছনে অনুবাদের উৎকর্ষের চেয়েও বইটির চমৎকার ও আকর্ষণীয় বিষয়বস্তুই প্রধান কারণ বলে আমি মনে করি। দীর্ঘ ২৮ বছর পর বইটি পুনরায় প্রকাশিত হলো। সুযোগ পাওয়া গেল বলে কিছু কিছু পরিমার্জনা করেছি। এতে প্রথম সংস্করণের ভাষাগত ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেকটা দূর করা সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয়। আমার বিশ্বাস প্রথম অনুপম সংস্করণও বইটির বড়-ছোট সব বয়সের পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হবে। আবারও বলি বইঘর খ্যাত শফি ভাই-এর অনুপ্রেরণা না পেলে এ বইটি হয়তো আমি কখনো অনুবাদই করতাম না।

সুব্রত বড়ুয়া

সূচি

বার্লিন যাত্রার শুভ উদ্যোগ ☐ ৯
পুলিশ রইলো চুপচাপ ☐ ১৫
অপরিচিত একজনের সাথে একা ☐ ১৯
দুরন্ত দুঃস্বপ্ন ☐ ২৪
পিছু নেয়া হলো শুরু ☐ ২৯
সতর্ক চোখে ট্রাম পাহারা ☐ ৩৩
ফুলের দোকানে দীর্ঘ প্রতীক্ষা ☐ ৩৭
মোটরের ভেঁপু হাতে সেই ছেলেটা ☐ ৪০
জড়ো হলো সব ডিটেকটিভ ☐ ৪৬
ফাঁদে পড়লো শিকার ☐ ৫১
হোটেলের ভিতরে গুপ্তচর ☐ ৫৮
সবুজ পোশাকের দু'জন লিফ্‌ট-বয় ☐ ৬২
ভিড় শুধু ভিড় ☐ ৬৬
আলপিনের ফুটোর কেরামতি ☐ ৭১
পুলিশ হেডকোয়ার্টার ☐ ৭৫
এমিলের অনেক টাকা ☐ ৮৪
মিসেস টিশবাইনকে আমন্ত্রণ ☐ ৮৯
শেখার কথা হচ্ছে ☐ ৯৫

বার্লিন যাত্রার শুভ উদ্যোগ

"এমিল," মিসেস টিশবাইন ডেকে বললেন, "গরম পানির জাগ্‌টা নিয়ে আয়তো এদিকে।" বড়ো একটা পাত্র আর তরল ক্যামোমিল শ্যাম্পুর ছোট্ট একটি নীল বাটি নিয়ে তিনি তাড়াহুড়ো করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে সামনের ঘরের দিকে চলে গেলেন। গরম পানির সেই জাগ্‌টা নিয়ে এমিল চললো তাঁর পেছন পেছন।

শাদা একটা বেসিনের সামনে মাথাটা নিচু করে সামনের ঘরে এক ভদ্রমহিলা বসেছিলেন। তাঁর লম্বা সোনালি চুলগুলো এলোমেলো আর উলের মতো তিনগোছা পড়েছিলো তাঁর মুখের ওপর। এমিল সেজন্যেই দেখতে পায় নি কে তিনি। এমিলের মা মহিলাটির মাথায় তরল শ্যাম্পুর সবটুকু ঢেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "খুব বেশি পরম নাকি?"

"না-না ঠিক আছে," উত্তরে বললেন ভদ্রমহিলা। মিসেস টিশবাইন শ্যাম্পু ঘষতে লাগলেন। তারপর একসময় তাঁর খদ্দেরের মাথাটা ঘন শাদা ফেনায় ভরে উঠলো। ভদ্রমহিলার গলা শুনে এমিল চিনতে পারলো, চেঁচিয়ে বললো, "আরে, মিসেস উইর্থ যে ইনি।" ভদ্রমহিলা রুটিওয়ালার স্ত্রী। এমিল তাঁকে খুব ভালো করেই চেনে। "গুডমর্নিং মিসেস ইউর্থ," বলে এমিল বেসিনের নিচে মাথা ধোয়ার জাগ্‌টা নামিয়ে রাখলো।

"এমিল! শুনলাম তুই নাকি বার্লিন যাচ্ছিস্? কি ভাগ্যি তোর!" বলে উঠলেন মিসেস উইর্থ। গলা শুনে মনে হলো যেন মুখটা তাঁর ভরে আছে টাটকা ক্রীমে। 'প্রথমে ও তো যেতে চাচ্ছিলো না মোটেই,' বললেন এমিলের মা। তিনি তখনো মাথাটা ঘষছিলেন।' 'কিন্তু এই পুরো বন্ধটা এখানে থেকে ও কি করবে? কখনো বার্লিন যায় নি এমিল। আর আমার বোন মার্থা অনেকবার আমাদের নিয়ে যেতে চেয়েছে। আপনি তো জানেন ভাই, ওরা বেশ সুখেই আছে ওখানে। মার্থার স্বামী কাজ করছে পোস্টাপিসে। এমিলের সঙ্গে যেতে পারছিনে আমি, আমার কপালটাই খারাপ। ছুটির সময়টাতে আমার চাপ সবচে' বেশি। এমিল কিন্তু এখন দিব্যি বড় হয়ে গেছে। ও একাই যেতে পারবে সামলে-সুমলে। মা লিখেছেন, ইস্টিশানে এসে ওকে নিয়ে যাবেন। ফুলের দোকানটার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকবেন তিনি।"

মাথা-ধোয়ার বেসিন থেকে মাথাটা না তুলেই মিসেস উইর্থ জানালেন, "বার্লিন যে ওর ভীষণ ভালো লাগবে এতে আমার একটুও সন্দেহ নেই। বাচ্চাদের মনের মতো জায়গা বটে। গেলবারের আগের বছর স্কিটল ক্লাবের সাথে গিয়েছিলাম আমরা বেড়াতে। বাব্বা! কী হৈ চৈ আর মজা সেখানে! জানেন—রাস্তায় এতো আলোর ছড়াছড়ি যে সেখানে রাতের বেলাও পরিষ্কার দিনের মতো। আর কী গাড়ি-ঘোড়ার ভিড়! কতো যে মোটর-গাড়ি!"

"অনেক বিদেশী মোটর আছে সেখানে ?"—প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলো এমিল।

"বলতে পারলামনা তা"—কাঁধে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে উত্তর দিলেন মিসেস উইর্থ। নাকের মধ্যে সাবানের ফেনা ঢুকে যাওয়ায় হেঁচে উঠলেন তিনি হঠাৎ।

"এমিল! তুই বরং এখন গিয়ে তৈরি হয়ে নিতে পারিস," এমিলের মা বললেন। "তোর ভালো স্যুটটা শোবার ঘরে রেখে দিয়েছি আমি। তুই পোশাক পরে নিলে মিসেস উইর্থ-এর চুলটা ঠিক করে দিয়ে আমরা ডিনার খেয়ে নিতে পারি।"

"কোন্ শার্টটা পরবো আমি মা ?" এমিল জানতে চাইলো।

"বিছানার ওপর সবকিছুই রেখেছি আমি বাপু। আগে ভালো করে হাত-মুখ ধুয়ে নিস। আর দেখিস মোজাটা যেন উল্টো করে পরিস না। জুতার জন্য এক জোড়া নতুন ফিতেও রেখেছি সেখানে, বুঝলি! যা এবার, পালা এখানে থেকে।"

"ঠিক আছে, যাচ্ছি আমি," বলে এমিল চলে গেলো।

মিসেস্ উইর্থ আয়নার দিকে নিজেকে দেখে যখন বুঝলেন যে, চুলগুলো তাঁর বেশ চমৎকার সাজানো হয়ে গেছে, তখন তিনিও চলে গেলেন খুশি হয়ে। মিসেস টিশবাইন শোবার ঘরে চলে এলেন এবার। এসে দেখলেন হাঁড়ির মতো মুখ করে বসে আছে এমিল।

"রবিবারের স্যুটটা যে কার মাথায় গজিয়েছিলো, যদি জানতে পেতাম—" বিড়বিড় করে বলে উঠলো এমিল।

"কেন?" মিসেস টিশবাইন প্রশ্ন করলেন।

"যদি জানতাম কোথায় থাকে সে—তাহলে এক্ষুনি নিয়ে গুলি করে আসতাম সে বেটাকে—আর কি!"

"বাছারে আমার! তোর যে কতো কষ্ট। আর এদিকে রবিবারের স্যুট নেই বলে কত ছেলে যে ফ্যা ফ্যা করছে! যাকগে সেসব—আমাদের সবারই দুঃখ-কষ্টতো আছেই। আর—হ্যাঁ, ভালো কথা—আজ সন্ধ্যেয় তোর মার্থা খালাকে বলিস একটা হ্যাঙ্গার দিতে। স্যুটটা খোলার পরে ঝুলিয়ে রাখতে ভুলিস না। ঝোলাবার আগে বেশ ভালো করে ব্রাশ করে নিবি কিন্তু। আগামীকাল তোর পুরোনো জার্সিটা আবার পরতে পারবি তুই। সেটা পরলে তোকে অবশ্য বোম্বেটের মতো দেখায়, কিন্তু কি আর করবি। দাঁড়া, দেখি কি কি নিতে বাকি রইলো তোর। স্যুটকেসটা তো গুছিয়ে রেখেছি আগেই। তোর খালার জন্য ফুলগুলো মুড়ে দিয়েছি কাগজে। ডিনারের পর তোর নানীর টাকাটা দিয়ে দেবো তোকে। এবার চলুন, ক্ষুদে ভদ্রলোক মশাই—খাওয়ার ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলা যাক,"—বলে এমিলের কাঁধে হাত দিয়ে প্রায় ঠেলেই তাকে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন তিনি।

খাবারের মধ্যে ছিলো হ্যাম দেয়া ম্যাকারনি চীজ—এটা হচ্ছে এমিলের প্রিয় খাবার। সে প্রায় উপুড় হয়ে পড়ে গোগ্রাসে খেয়ে চললো। চলে যাবার ঠিক আগে এমন গোগ্রাসে খাচ্ছে বলে মা বারকয়েক আড় চোখে তার দিকে তাকালো। কিন্তু না, তার মন তখন অন্য দিকে।

কিছুক্ষণ পর এমিলকে বললেন তিনি, "পৌঁছেই একটা পোস্টকার্ড পাঠাবি কিন্তু। স্যুটকেসের একেবারে উপরে একটা কার্ডও রেখেছি তোর জন্য।"

"ঠিক আছে,." এমিল জবাব দিলো। সে তখন এক টুকরো কুচি ম্যাকারনি প্যান্টের উপর থেকে চুপি চুপি সরাতে ব্যস্ত। কপালটা ভালোই বলতে হবে। মা কিছুই লক্ষ্য করলেন না। তিনি তখন তাঁর শেষ উপদেশগুলি শুনিয়ে চলছেন।

বলে চললেন, "সবাইকে আমার ভালোবাসা জানাস্। আর নিজের দিকে একটু খেয়াল রাখিস বাপু। দেখবি তুই, এখানে নয়স্টডটের তোর জানা সবকিছু থেকে বার্লিন অনেক বেশি অন্য রকম। তোর রবার্ট খালু বলেছেন রোববারে তোকে তিনি মিউজিয়ামে নিয়ে যাবেন। দেখিস্, ভালো ছেলের মতো ব্যবহার করবি। কেউ যেন বলতে না পারে শিক্ষা-দীক্ষার বালাই নেই তোর মধ্যে।"

"ঠিক আছে সব। এই আমি কথা দিচ্ছি।" বললো এমিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর সামনের ঘরে এলো ওরা। মিসেস টিশবাইন তাক থেকে টিনের একটি বাক্স নামিয়ে গুনে দেখতে লাগলেন টাকাগুলো। তিনি একবার মাথা নাড়লেন, তারপর আবার গুনে দেখলেন।

"কাল বিকেলে কে কে এসেছিলো এখানে? মনে করতে পারিস্ কিনা দেখ এমিল," চিন্তিত স্বরে বললেন তিনি। "মিস্ টমাস আর মিসেস হমবুর্গ," একটু ভেবে উত্তর দিলো এমিল।

"হ্যাঁ। আমারও তাই মনে হয়। তাহলে তো টাকা কম পড়ছে এখানে।" হিসেব রাখার খাতাটা বের করে কয়েকটি নতুন অংক বসালেন তিনি সেখানে। "আট শিলিং কম পড়ছে তাহলে।" শেষ-মেশ বললেন তিনি।

'গ্যাসওয়ালা এসেছিলো আজ সকালে।" এমিল মনে করিয়ে দিলো এবার তাঁকে।

"ও—হ্যাঁ-হ্যাঁ! মনে পড়েছে এবার। আমার হিসেব থেকে আট শিলিং কম পড়বার কথাই বটে। ভাগ্যটা আমার খারাপ তো নিশ্চয়ই।" মৃদু স্বরে শিস দিয়ে উঠলেন তিনি। যেন অই শিসের সাথে উড়িয়ে দিতে চাইলেন সব কষ্ট। তারপর বাক্সের ভেতর থেকে তিনটে নোট বের করে নিলেন।

এমিলকে উদ্দেশ করে বললেন, "দেখ! সাত পাউন্ড আছে এখানে। একটা পাঁচ পাউন্ডের নোট আর দু'টো এক পাউন্ড করে। তোর নানীকে দিবি ছ'পাউন্ড। আর বলবি ইদানীং টাকা পয়সা পাঠাতে পারিনি বলে তিনি যেন রাগ না করেন। বলবি– আমারও খুব টানাটানি চলছে। আর এজন্য তুই নিজেই টাকাটা নিয়ে এসেছিস। বরাবরের চেয়ে একটু বেশিই দিলাম এবার। আর শোন, আমার হয়ে তাঁকে একটা মিষ্টি চুমু দিস্। মনে থাকবেতো সব? বাকি এক পাউন্ড তোর নিজের জন্য। আসতে ভাড়া লাগবে তোর প্রায় দশ শিলিং। ওটা আলাদা করে রেখে দিবি। বাইরে খেলে নিজের ভাগের খরচটা দিবি। কয়েক শিলিং অন্তত পকেটে রাখিস্—হঠাৎ যদি দরকার পড়ে যায়। শোন, তোর মার্থা খালার চিঠির খামে টাকাটা রাখছি আমি। দোহাই বাছা তোর হারিয়ে ফেলিস্নে যেন। আর কোথায় এটা রাখবি বলতো?"

নোটগুলো পুরোনো একটা খামে ঢুকিয়ে ভাঁজ করে এমিলকে দিলেন তিনি সেটা।

একটু ভেবে শেষ-তক্ কোটের ভিতরকার ডানদিকের পকেটের একেবারে নিচে সেটি ঢুকিয়ে ফেললো এমিল। তারপর বাইরে থেকে চাপড়ে দেখলো বেশ টের পাচ্ছে সে খামটাকে।

"এখান থেকে বাছাধন যে কি করে বেরুবে সে কথা আর ভেবে পাচ্ছি না আমি," বেশ নিশ্চিত সুরে বললো সে কথা ক'টি।

"দেখিস্, ট্রেনে যেন লোকজনকে বলে বেড়াসনে যে তোর কাছে অতো টাকাকড়ি আছে।"

"তাই যেন বলে বেড়াই আমি!" বেশ একটু বিরক্ত হয়ে বললো এমিল।

টিনের বাক্সটা আলমারির তাকে তুলে রাখবার আগে সেটা থেকে কিছু টাকা-কড়ি বার করে মানিব্যাগে রাখলেন মিসেস টিশবাইন। তারপর যে ট্রেনে এমিলের যাবার কথা সেটা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবার জন্য আর একবার বোনের চিঠিটার উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলেন তিনি।

তোমরা হয়তো ভাবছো, সাত পাউন্ডের এই ব্যাপারটা যেন একটু বাড়াবাড়ি রকমের হলো। হয়তো তাই। যারা মাসে একশ' বা হাজার পাউন্ড রোজগার করে তারা মাত্র সাত পাউন্ড নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না। কিন্তু বিশ্বাস করো, বেশির ভাগ লোকেই রোজগার করে তারচে' অনেক কম। তাদের কাছে সাত পাউন্ড জমানোর ব্যাপারটা অনেকখানি যাদের সাপ্তাহিক আয় পঁয়ত্রিশ শিলিং। এমন অনেক লোক আছে যারা পাঁচ পাউন্ড একসাথে খরচ করতে পারলে নিজেকে কোটিপতি ভাবতে পারে। আর স্বপ্নেও তারা ভাবে না যে কারো সত্যিই কোটি পাউন্ড থাকতে পারে!

এমিলের বাবা নেই। তাই নিজের আর এমিলের খরচ চালাবার জন্যে মিসেস টিশবাইনকে খাটতে হয়। নিজেদের একটি ঘরকে তিনি কেশবিন্যাসের দোকানে পরিণত করেছেন। দিনের পর দিন তিনি সেখানে মেয়েদের সোনালি আর বাদামি চুল ছাঁটেন, ধুয়ে দেন আর আঁচড়ে দেন সুন্দর করে। শুধু বাড়ি ভাড়া, গ্যাস আর কয়লার বিল, কিংবা তাঁদের দু'জনের খাবারের দাম আর জামাকপড় কেনার জন্যে রোজগার করলে তাঁর চলে না, এমিলের স্কুলের বেতন আর বই কেনার পয়সাও আসে তাঁর অই রোজগার থেকে। মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি, তখন ডাক্তার ডাকতে হয়েছে আর ডাক্তার বলেছেন তাঁকে এক শিশি ওষুধ খেতে—সেই খরচটাও দিতে হয়েছে তাঁকে। তেমন অবস্থা হলে এমিল তাঁর দেখাশোনা করেছে, এমনকি রান্নার কাজটাও করেছে। মাঝে মাঝে তিনি যখন ঘুমিয়ে থাকতেন, এমিল তখন ঘরের মেঝে ঘষে মুছে দিতো। পাছে বাড়িটা ভেংগে-চুরে পড়ে যাবে এই ভয়ে তিনি যতক্ষণ ঘুমোনো দরকার তার আগেই জেগে উঠেন। শুনলে তো তোমরা এখন সব। এমিল তার মায়ের একান্ত অনুগত ভালো ছেলে। এ নিয়ে তোমাদের হাসাহাসি করার কিছুই নেই। মাকে সে ভালোবাসে খুবই। সে জানে, মা তার খাটছেন তারই জন্য, যাতে অন্য ছেলেদের যা আছে তার সবগুলো তারও থাকে। একটু খেটে-খুটে না পড়লে, ক্লাসে অন্যদের থেকে টুকে নিতে হলে কিংবা স্কুল পালাবার কথা ভাবলে সে নিজে খুব ছোট হয়ে যায়। এ ধরনের কাজ করা মানে মাকে ঠকানো, তাঁর মনে কষ্ট দেয়া। এমন কাজের কথা কিছুতেই সে ভাবতে পারে না। মা মনে ব্যথা পেতে পারেন এমন কোনো কাজ করতে তার বাস্তবিকই ঘেন্না লাগে।

তাই বলে এমিল কিন্তু হাবা-গোবা মার্কা বোকা ছেলে নয়। অথবা এমন অস্বাভাবিক ভালো ছেলেও সে নয় যাতে দেখলেই মনে হতে পারে যেন বুড়ো হয়েই সে জন্মেছে। ভালো হবার জন্য রীতিমত কষ্ট করছে হয় তাকে। যেমন মিষ্টি খাওয়া কিংবা সিনেমায় ছোটার অভ্যেস ছাড়বার জন্য কোনো কোনো লোককে মারাত্মক কষ্ট করতে হয়। কখনো কখনো এই ভালো হয়ে থাকাটা তার কাছে বেশ দুরূহ বলেই মনে হয়। কিন্তু বছরের শেষ পরীক্ষায় গেলবারের মতো এবারও যে সে প্রথম হয়েছে এই কথাটা জানাতে পেরে সব কষ্ট তার সুদে-আসলে উশুল হয়ে যায়। মা বেশ খুশি হন এতে আর এটা তিনি চেপে রাখেন না কখনো। এটাও তার মনে হয় যে, মা তার জন্য যা করেন এটা যেন খানিকটা তার প্রতিদানের মতোই।

যাক্‌গে সে সব। এখন আবার আসল গল্পে ফিরে আসা যাক্।

মিসেস টিশবাইন বলে উঠলেন, "হায় আল্লাহ্। কাণ্ড বটে! সোয়া একটা বাজে এখন। ইস্টিশানে যাবার সময় হয়ে গেছে। জানিস্ তো, ঠিক দু'টোর আগেই ট্রেন ছাড়ে।"

"চলো তাহলে মা," এমিল বললো। "স্যুটকেসটা কিন্তু আমিই নিয়ে যাচ্ছি। তুমি যেন আবার অন্য কিছু ভেবে বসোনা মা!"

পুলিশ রইলো চুপচাপ

বাইরে আসতেই এমিলের মা বললেন, "ঘোড়ার ট্রামগাড়িটা এদিকে এলে আমরা ওতে করে ইষ্টিশানে যেতে পারতাম। ঠিক তখুনিই কোণের দিকটা থেকে ওটিকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেলো। এমিল ট্রাম-গাড়িটাকে থামাবার জন্য হাত দেখালো।

যদি তোমরা কেউ ঘোড়ায় টানা ট্রাম-গাড়ি দেখে না থেকো, তাহলে অল্পের মধ্যে ওটির একটা বর্ণনা দিচ্ছি আমি। আসলে সাধারণ একটি ট্রামের মতোই দেখতে, চলে তেমনি ট্রাম লাইনের ওপর দিয়ে যদিও নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ওটির আছে। বুড়ো একটা টাট্টু ঘোড়া ট্রামকে টেনে নিয়ে যায়। এমিল এবং তার বন্ধুরা ঘোড়াটাকে তাদের শহরের জন্য লজ্জার ব্যাপার মনে করতো। তেমন একটা সুদিনের আশা করছিলো তারা যখন এই নয়স্টডট্ শহরেও চলবে বৈদ্যুতিক ট্রাম। মাথার ওপরের এবং মাটির নিচের তারের সাহায্যে চলবে সেটি আর সামনে পাঁচটি ও পেছনে তিনটি বাতি জ্বলবে জৌলুসের সাথে। কিন্তু শহরের মহামান্য মেয়রের ধারণা এক ঘোড়ার শক্তি দ্বারা চালিত এই সেকেলে ট্রামটি ছোট্ট শহরটির জন্য যথেষ্ট। অর্থাৎ বৈদ্যুতিক ট্রামের ব্যাপারটা চিন্তা করার কোনো প্রশ্নই আসে না। ঘোড়ায় টানা ট্রামের অবশ্য স্টিয়ারিং হুইল অথবা ব্রেক কোনোটাই নেই। ড্রাইভার বাঁ হাতে লাগাম ধরে ডান হাতে নেয় চাবুক। ট্রাম ছাড়ার আগে চেঁচিয়ে বলে সে, "জলদি উঠুন।"

ড্রাইভারের সিটের পেছনে কাঁচের পার্টিশন আছে একটা। বড় রাস্তায় যারা থাকে তাদের যে-কেউ ইচ্ছে করলেই নিজের বাড়ির সামনে ট্রামটা দাঁড় করাতে পারে। ড্রাইভারের সিটের পেছনে কাঁচের পার্টিশনটার ওপর কয়েকটি টোকা মারলেই দাঁড়িয়ে পড়ে গাড়ি। ড্রাইভার তার অভ্যস্ত শব্দ করলেই দাঁড়িয়ে যায় ঘোড়াটা। ট্রাম কোম্পানি কিংবা অন্য কারো এতে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। এতে মনে হয়, নয়স্টডটের সবার, মায় এই ঘোড়াটার শুদ্ধু, হাতে প্রচুর সময়। যার খুব বেশি তাড়া থাকে সে হেঁটেই চলে যায়।

ট্রাম ইস্টিশানে এসে পৌঁছলে এমিল ও তার মা নেমে পড়লো। প্লাটফর্মে এমিল যখন স্যুটকেসটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো, তখন পেছন থেকে হেড়ে গলায় ডাক শোনা গেলো, "হ্যাল্লো! যাওয়া হচ্ছে কোথায়? স্যুইজারল্যান্ডে নাকি?" এমিল ফিরে দেখলো, গলাটা পুলিশ সার্জেন্ট ইয়েশ্‌কে-এর।

মিসেস টিশবাইন বললেন, "না--না। আমার ছেলেটা যাচ্ছে বার্লিনে। সেখানে আমাদের আত্মীয়দের কাছে এক সপ্তাহ থাকবে সে।"

কিন্তু সার্জেন্টকে দেখে এমিলের অপরাধী মনটা ভয় পেলো। আর গলার স্বর শুনে বুকের ভেতরটা তার শুকিয়ে উঠলো। দিন কতক আগে সে আর তার কয়েকজন বন্ধু ইস্কুল থেকে ফেরার পথে বাজারের মধ্যেকার গ্র্যান্ড ডিউক চার্লস-এর মূর্তিটার মাথায়

একটা ফেল্টের পুরোনো টুপি চাপিয়ে দিয়েছিলো। নদীর পাশে মাঠের মধ্যে হচ্ছে তাদের ইস্কুল। লোকে সেই মূর্তিটাকে বলে 'হঁকো-মুখো চার্লস'। এমিল আঁকতে পারে ভালো। টুপি পরানো হয়ে গেলে বন্ধুরা এমিলকে ধরাধরি করে উপরে তুলে দেয়। আর এমিল ডিউকের মুখে খড়ি দিয়ে এঁকে দেয় একজোড়া কালো গোঁফ এবং লাল একটি নাক। সে যখন তার শিল্পকর্মে শেষ টান দিচ্ছে এমনি সময়ে চকের মোড় থেকে বেরিয়ে আসেন সার্জেন্ট ইয়েশকে। তাঁকে দেখতে পেয়ে পালাবার জন্য সবাই ভোঁ ভোঁ করে দৌড় মেরেছিলো। কিন্তু মনে ভীষণ ভয় ছিলো তাদের পাছে কাউকে তিনি হয়তো চিনতে পেরেছেন।

যাহোক, ইয়েশ্‌কে সেই ঘটনার কথা একটুও উল্লেখ করলেন না। তিনি শুধু এমিলের শুভ-যাত্রা কামনা করলেন। আর তার মাকে জিজ্ঞেস করলেন কেমন আছেন তিনি এবং ব্যবসাটা কেমন চলছে।

এমন সাদামাটা ব্যাপার সত্ত্বেও এমিলের ভয় গেল না। ইস্টিশানে স্যুটকেশ বয়ে নিয়ে যাবার সময় তার হাঁটু কাঁপতে লাগলো। কেবলই তার মনে হতে লাগলো সার্জেন্ট হয়তো এক্ষুনি বলে উঠবেন, "মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়াও এমিল টিশবাইন! তোমাকে আইনত গ্রেপ্তার করা হলো।" অথচ তেমন কোনো বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটলোনা। কে জানে, হয়তো তিনি অপেক্ষা করছেন এমিলের বাড়িতে ফিরে আসা পর্যন্ত।

টিকিট-ঘরের কাউন্টারে গিয়ে মিসেস টিশবাইন নিজের জন্য একটি প্ল্যাটফরম টিকিট আর এমিলের টিকিট কিনলেন—থার্ড ক্লাসের টিকিট অবশ্য! নয়স্টডটের ইস্টিশানে চারটে প্লাটফরম। বার্লিন যাবার ট্রেন যে প্ল্যাটফরমে আসবে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো তারা দু'জন। হাতে আরো কয়েক মিনিট সময় আছে তখনো।

এমিলের মা বললেন এবার, "সাবধানে থাকিস্ কিন্তু বাছা, ট্রেনে যেন কিছু ফেলে চলে যাস্‌নে। ফুলগুলোর ওপর আবার ধপ্ করে বসে পড়িস্ না যেন। ট্রেনে উঠে কাউকে বলিস উপরের র‍্যাকে স্যুটকেসটা তুলে দিতে। ভদ্রভাবে বলিস কিন্তু, বুঝলি?"

এমিল বললো, "ও আমি নিজেই পারবো। বাচ্চা তো নই আর এখন আমি!"

"ভালো, ভালো—নিজেই তুলে রাখিস তাহলে। আর মনে রাখিস, নামবার ইস্টিশানটা পেরিয়ে যাসনে যেন। মনে রাখবি, ইস্টিশানটার নাম ফ্রিয়েডরিশ স্ট্রীট স্টেশন—ছ'টা বেজে সতের মিনিটে পৌঁছবার কথা ওখানে। আর হ্যাঁ—ভালো কথা, আগে থাকতে কোথাও যেন নেমে পড়বি না। আগের ইস্টিশানটার নাম জুলজিক্যাল গার্ডেন্‌স্। সেখানেই আবার নেমে পড়িস না যেন।"

"ও আমার বুড়ি মা মণি গো, অতো ভাবার দরকার নেই"—একটু ফাজলামির সুরে বললো এমিল।

"তুইও বাপু আমার সাথে যেভাবে কথা বলিস অমন করে আর কারো সাথে বলিস না," মিসেস টিশবাইন উত্তর দিলেন। "স্যান্ডউইচ খেয়ে নেবার পর গাড়িতে আজে-বাজে ময়লা কোনো কিছু ফেলিস না। আর লক্ষ্মী সোনামণি আমার, টাকাটা হারাসনে কিন্তু।"

মার শেষের কথাটি শুনে এমিল খপ করে পকেটটা চেপে ধরলো ভয়ে। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো একটা। "যাক্ বাবা, ঠিকই আছে এখনো!" বললো সে নিশ্চিন্ত হয়ে।

মায়ের হাতটা জড়িয়ে ধরলো এবার এমিল। তারপর তারা দু'জনে প্ল্যাটফরমের এদিক থেকে ওদিকে হেঁটে বেড়াতে লাগলো।

এবার ভারিক্কি হবার পালা এমিলের, "আমি নেই বলে কিন্তু সবসময় কাজ-কাজ করো না, মা। মনে রেখো, অসুখ বাধিয়ে বসলে তোমাকে দেখার জন্য এখানে আর

কেউ নেই। খুব বেশি হলে এক সপ্তাহ, তার বেশি আমি থাকবো না সেখানে। চিঠি দিতে ভুল করো না কিন্তু।" বলে সে জড়িয়ে ধরলো মাকে। তিনি তার নাকের ডগায় চুমু দিলেন।

বার্লিনের ধীরগতি ট্রেনটি ফোঁশ ফোঁশ করে ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে ইষ্টিশানে এসে থামলো। আর একবার মাকে জড়িয়ে ধরে স্যুটকেসটা নিয়ে এমিল ট্রেনে উঠে পড়লো। মা তার হাতে ফুল আর স্যান্ডউইচগুলো তুলে দিয়ে জানতে চাইলেন সেখানে তার জন্য কোনো সিট খালি আছে কিনা। মাথা হেলিয়ে সে জানালো যে, আছে। মা আবার বললেন, "ফ্রিয়েডরিশ্ স্ট্রীট স্টেশনে তোকে নামতে হবে, মনে রাখিস ভালো করে।"

আবার সে মাথা নুইয়ে উত্তর দিলো।

"তোর নানীকে খুঁজে বের করিস। ফুলের দোকানের পাশটিতে দাঁড়িয়ে থাকবেন তিনি তোর জন্য।"

আবার মাথা হেলালো সে।

"ওরে দুষ্টু ছেলে—ভালো হয়ে থাকিস কিন্তু সবসময়।" এবারও মাথা হেলালো সে।

"তোর খালাতো বোন পনির সাথে ঝগড়া-টগড়া করিসনে যেন। মনে হচ্ছে তোরা কেউ কাউকে চিনতেই পারবিনে।"

এবার আর একবার মাথা নোয়ালো সে।

"চিঠি লিখিস পৌছেই।"

"তুমিও লিখো," বললো সে। আর ট্রেনের সময়-সূচি মতো ট্রেন না ছাড়লে এমনিধারা কথা-বার্তা হয়তো অনন্তকাল ধরে চলতো। গার্ড হাঁক পাড়লো, "উঠে পড়ুন সবাই, উঠে পড়ুন।" সশব্দে কামরার দরজাগুলো বন্ধ হয়ে গেলো। তারপর ট্রেনটা ধীরে ধীরে ইস্টিশান ছেড়ে চলতে শুরু করলো।

যতক্ষণ ট্রেনটা দেখা গেলো ততক্ষণ মিসেস টিশবাইন হাতের রুমালটা নাড়লেন, তারপর ফিরে হেঁটে চললেন ধীর পায়ে। তখনও রুমালটা তাঁর হাতে ধরা। সেটা দিয়ে চোখ মুছলেন তিনি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে মনটা তাঁর হাল্কা হয়ে এলো। মনে পড়লো তাঁর, মাংস-বিক্রেতার স্ত্রী মিসেস আগুস্টিনের আসার কথা আছে। বাড়ি পৌঁছেই দেখবেন হয়তো দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

অপরিচিত একজনের সাথে একা

ট্রেন চলতে শুরু করলে এমিল কামরার সবাইকে গুড আফটারনুন জানালো এবং বিনয়ের সাথে টুপি খুলে ফেললো।

"মাফ করবেন, এখানে কারো জায়গা আছে কি?" জিজ্ঞেস করলো সে, যদিও সে দেখতে পাচ্ছিলো সত্যি সত্যি ওখানে কেউ নেই।

মোটা এক ভদ্রমহিলা পায়ে ব্যাথা পাচ্ছিলেন বলে বাঁ পায়ের জুতোটা খুলে বসেছিলেন। পা'টা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি আর বেদনার উপশমের জন্য আঙুলগুলো নেড়ে-চেড়ে দিচ্ছিলেন।

"আজকালকার ছেলেরা এতো বিনীত আর ভদ্র হয় না," পাশের লোকটির উদ্দেশে বললেন তিনি। নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় প্রতিবার অস্বস্তিকর শব্দ করছিলেন সে ভদ্রলোক। "আমাদের ছেলেবেলার সাথে এখনকার চালচলনের কোনো তুলনাই হয় না।"

এমন-ধারা মন্তব্য এমিল আগেও শুনেছে। তাই, এখন সে ওটা কানেই তুললো না। অতীতের সুদিনগুলির জন্য কিছু লোক সবসময়েই হা-হুতাশ করে থাকে, যেন কোনো কিছুই আর আগের মতো তেমন ভালো নেই—এমনকি তাদের ধারণাই, বাতাসটাও আর আগের মতো পরিষ্কার নয়। কিন্তু এদের কথা বিশ্বাস করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাদের কথা পুরোপুরি মিথ্যেও নয়, অথবা পুরোপুরি সত্যও নয়। আসলে তারা কখনো সন্তুষ্ট নয়। আর সবসময়ে ভাবে, এখনকার চেয়ে আগের দিনের সবকিছুই ছিলো অনেক ভালো।

এমিল তার ডান পকেটের উপর হাত দিলে খড়খড় করায় এনভেলাপটার সঠিক অস্তিত্বটা অনুভব করতে পেরে আশ্বস্ত হলো। অথচ অন্য যাত্রীদের সবার চেহারাই বেশ সৎ লোকের মতো। কাউকে দেখেই চোর কিংবা খুনী ভাববার কোনো কারণ নেই। যে লোকটা ফোঁশ ফোঁশ করে নিশ্বাস ফেলছিলেন তাঁর পাশে মোটা এক ভদ্রমহলা কুরুশ-কাঁটা দিয়ে শাল বুনছিলেন। এদিকে এমিলের পাশে জানালার ধারে বৌলার টুপি-পরিহিত এক ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

লোকটি হঠাৎ খবরের কাগজটা গুটিয়ে রাখলেন। তারপর পকেট থেকে চকোলেটের একটা টুকরো বের করে এমিলের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, "খোকা, এটা খাবে?"

"ধন্যবাদ," বললো এমিল। তারপর, ভদ্রতার রীতি-নীতির কথা মনে পড়ায় টুপি খুলে মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে বললো, "আমার নাম এমিল টিশবাইন।"

অন্য যাত্রীরা মুখ টিপে হাসছিলো ততক্ষণে। সেই ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে তাঁর টুপিটা তুলে বললেন, "তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় সুখী হলাম। আমার নাম গ্রুন্ডআইস।"

যে মোটা ভদ্রমহিলা জুতো খুলে বসেছিলেন তিনি এমিলকে জিজ্ঞেস করলেন, "নয়স্টড্‌টে মিঃ কুর্জালস্-এর জামা-কাপড়েরর দোকানটি এখনো আছে তো ?"

এমিল উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, আছে। আপনি চেনেন তাঁকে? দোকানটা যে জায়গার ওপর, এখন তিনি সেটাও কিনে নিয়েছেন।"

"তাই নাকি? বেশ বেশ। তাঁকে বোলো গ্রস-গুনাউ-এর মিসেস জ্যাকব তাঁর কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন।" "কিন্তু আমি তো এখন যাচ্ছি বার্লিনে," এমিল বললো চট্ করে। "ঠিক আছে। বাড়ি ফিরে আসার পর বললেও চলবে," বলে মিসেস জ্যাকব আবার পায়ের আঙুলগুলোর খেদমত করতে লাগলেন। কি মনে করে তিনি এমনভাবে হেসে উঠলেন যে টুপিটা পড়ে গিয়ে তাঁর একটা চোখ ঢেকে ফেললো।

"আচ্ছা, তাহলে বার্লিন যাচ্ছ তুমি, তাই না ?" মিঃ গ্রুভআইস প্রশ্ন করলেন তাকে।

"হ্যাঁ, নানী আমাকে নিতে আসবেন ইস্টিশানে। ফ্রিয়েড্‌রিশ স্ট্রীট স্টেশনের ফুলের দোকানটার পাশে অপেক্ষা করবেন তিনি আমার জন্য।" উত্তর দিলো এমিল। তারপর সে বেশ ধীরে-সুস্থে কোটের পকেটটা চাপড়ে দেখলো। খস্ খস্ শব্দ হতেই সে বুঝে নিলো সব ঠিক আছে।

"এর আগে কখনো কি বার্লিন গেছ তুমি ?" মিঃ গ্রুভআইস জিজ্ঞেস করলেন।

এমিল বললো, "না।"

'তাহলে অবাক হবার মতো অনেক কিছু দেখতে পাবে তুমি সেখানে। একশ' তলা বাড়ি দেখেছো কখনো? দেখনি তো, যা ভেবেছিলাম। বার্লিনে তুমি দেখবে। আকাশের সাথে বাড়ির ছাতগুলো বেঁধে রেখেছে, যাতে সেগুলো উড়ে না যায়।—তারপর ধর তোমার যদি কোথাও যাবার খুব তাড়া থাকে—তাহলে সবচেয়ে কাছের ডাকঘরে চলে যাবে তুমি। তারা তোমাকে একটা বাক্সের মধ্যে ভালো করে প্যাক করে তুমি যেখানে যাবে সেখানকার ডাকঘরের উদ্দেশ্যে টিউবের মধ্যে দিয়ে সোঁ করে পাঠিয়ে দেবে। —আর টাকা-পয়সা যদি তোমার না থাকে, তবে ব্যাংকে গিয়ে তোমার মগজটার বদলে পঞ্চাশ পাউন্ড পেতে পারো। অবশ্য মগজ না থাকলে তুমি বেশিদিন বাঁচবে না—মাত্র একদিন কি দু'দিন। মগজটা ফেরৎ পেতে হলে ষাট পাউন্ড দিতে হবে তোমাকে। সেখানকার ডাক্তাররাও খুব আশ্চর্যভাবে অসুখ সারায়— ।"

"মনে হচ্ছে শেষবার ব্যাঙ্কে যখন গিয়েছিলেন নিজের মগজটা ফেলে এসেছেন সেখানে," ফোঁশ ফোঁশ করে যে ভদ্রলোক নিশ্বাস ছাড়ছিলেন তিনি বললেন। "যতোসব গাঁজাখুরি কথা ঢোকানো হচ্ছে ছেলেটার মাথায়।"

এরপর কি ঘটবে ভাবতে না পেরে মিসেস জ্যাকব পায়ের আঙুল দুমড়ানো বন্ধ করলেন। কুরুশের কাঁটা থেকে মুখ তুলে তাকালেন অন্য ভদ্রমহিলাটিও। বৌলার টুপি পরা ভদ্রলোকটি চটে উঠলেন বেশ। রীতিমত গরম গরম কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেলো। এমিল কিন্তু 'কুছপরোয়া নেই' ভাব নিয়ে বসে রইলো নির্বিকার। তারপর সে স্যান্ডউইচের প্যাকেটটা বের করলো, যদিও ডিনার খেয়েছে সে বেশিক্ষণ হয় নি। তৃতীয় স্যান্ডউচটার মধ্যে সসেজ ছিলো। সেটির মাত্র অর্ধেক খাওয়া হয়েছে তার, এমন সময় বড়ো এটা স্টেশনে এসে থামলো ট্রেন। এমিল স্টেশনের নাম-ফলকটা দেখতে পায় নি। প্লাটফরমের এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত কুলীরা কি চীৎকার করছিলো তার কিছুই সে বুঝতে পারলো না। কিন্তু ফোঁশ ফোঁশ করে নিঃশ্বাস-ফেলা সেই ভদ্রলোক, কুরুশ-কাঁটাওয়ালা ভদ্রমহিলা আর মিসেস জ্যাকব—সবাই নেমে গেলেন। আর একটু দেরী হলে মিসেস জ্যাকবের নামাই হতো না কারণ জুতোটা আবার পায়ে গলাবার জন্য দারুণ কসরৎ করতে হয়েছিলো তাঁকে। "মিঃ কুর্জালস্‌কে আমার কথা বোলো কিন্তু," তাড়াতাড়ি নামতে নামতে এমিলকে তিনি বললেন। এমিল মাথা নোয়ালো।

তারপর এমিল আর বৌলার টুপি-পড়া ভদ্রলোকটিই শুধু রইলো কামরাটাতে। এমিল খুব অস্বস্তিবোধ করতে শুরু করলো। কেমন যেন লোকটা। এই তিনি চকোলেট গছিয়ে দিচ্ছেন, আবার পরমুহূর্তেই একরাশ আবোল-তাবোল কথা বলে বোকা বানাতে চাচ্ছেন। নিছক সময় কাটাবার জন্য এমিলের ইচ্ছে হচ্ছিলো আর একবার নোটগুলো গুনে দেখার। কিন্তু একা মিঃ গ্রুন্ডআইসের সামনে নোটগুলো বের করার ভরসা হলো না তার। তাই ট্রেনটা ছেড়ে দিতেই পাশের বাথরুমে গিয়ে পকেট থেকে খামটা বের করলো সে। ঠিকই আছে নোটগুলো। গুনে দেখলো সে একবার। তারপর সে ভাবতে লাগলো কিভাবে

সেগুলো আরো নিরাপদে রাখা যেতে পারে। ভালো একটা ফন্দি এলো তার মাথায়। মনে পড়লো তার কোটের কলারের ভাঁজে একটা আলপিন গাঁথা আছে। পিনটা খুলে নিলো সে। তারপর কোটের লাইনিং-এর সাথে নোট তিনখানা সহ খামটা সে পকেটের মধ্যে গেঁথে রাখলো।

সে ভাবলো, "ব্যস। এবার আর এটির খোয়া যাবার সম্ভাবনা খুব একটা নেই।" এবার সে ফিরে এলো কামরায়।

মিঃ গ্রুন্ডআইস ততক্ষণে কোনার দিকের একটা সিটে বেশ আরাম করে বসেছেন। এমিলের মনে হলো ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি। অতএব তাঁর সঙ্গে এমিলের আর বকর বকর করতে হলো না। জানালার বাইরে তাকালো সে। এটা তার ভারী পছন্দ। গাছ, হাওয়া-কল, মাঠ, কারখানা, গরু, হাত নাড়াতে-থাকা চাষী—সবাই কেমন যেন চোখের সামনে এসে হারিয়ে যেতে লাগলো। এমিলের মনে হলো যেন বিরাট এক গ্রামোফোন-রেকর্ডের উপর বসিয়ে দেয়া হয়েছে সবাইকে। কিছুক্ষণ দেখার পর একঘেয়ে লাগতে লাগলো তার।

মিঃ গ্রুডআইস ঘুমোতে লাগলেন। সত্যি-সত্যি নাক ডাকতে শুরু করলো তাঁর। এমিলের ভারী ইচ্ছে করছিলো কামরার মধ্যে এদিক-ওদিক পায়চারি করে বেড়াতে। কিন্তু ভয় হলো তার, পাছে হয়তো বা ভদ্রলোক জেগে উঠেন। তাঁকে জাগিয়ে তুলতে চাইছিলো না সে। উল্টোদিকের সিটে ঠেস দিয়ে বসে এমিল তাঁকে দেখতে লাগলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। সবসময় উনি টুপি পড়ে আছেন কথাটা ভেবে হাসি পেলো তার। মুখটা তাঁর লম্বা মতোন, ছোটো একজোড়া কালো গোঁফ আর মুখের চারপাশে অসংখ্য রেখা। কান দু'টো তাঁর পাতলা আর মাথার দু'পাশে খাড়া হয়ে আছে।

উঃ। লাফিয়ে উঠলো এমিল। প্রায় ঘুমিয়ে পড়ছিলো সে। ঘুমুনো তার একেবারে চলবে না। সে আশা করছিলো কেউ একজন উঠে আসবে কামরাটায়। তা'হলে বৌলার টুপি পরা লোকটির সাথে তাকে আর একলা থাকতে হয় না। কিন্তু কেউ আর উঠে এলোনা। অথচ বেশ কয়েকটি স্টেশনে থামলো ট্রেন। সবে মাত্র চারটে বাজে তখন। বার্লিনে পৌঁছার আরো দু'ঘন্টা বাকি। চিমটি কাটতে লাগলো সে নিজের পায়ে। কেননা এভাবেই স্কুলে ইতিহাসের ক্লাশে সে সবসময়ে জেগে থেকেছে। তারপর সে ভাবতে লাগলো এখন কেমন দেখতে হয়েছে তার খালাতো বোন পনি। কারণ, সত্যি কথা বলতে কি, এখন তার মুখটা মোটেই মনে পড়ে না এমিলের। শুধু মনে পড়ে—অনেকদিন আগে নানী ও মার্থা খালা একবার পনিকে নিয়ে নয়স্টডটে এসেছিলেন। আর তখন পনি কেবলই তার সাথে শুধু লড়াই করতে চাইতো। সে অবশ্য লড়তে চায় নি। পনিকে তখন বড় জোড় ফ্লাই-ওয়েট (প্রায় এক মণ পনের সের) ধরা যেতো আর সে নিজে ছিলো ওয়েল্টার-ওয়েট মানে প্রায় এক মণ বত্রিশ সের। অতএব ওর সাথে লড়াই করাটা এমিলের জন্য মোটেই শোভন হতো না। পনিকে কথাটা বুঝিয়েও বলেছিলো সে। সে একটা আর-কাট ঝাড়লে আর দেখতে হতো না, দেয়ালে লেপ্টে যা একটা কিছু বাকি থাকতো পনির সেটা চেঁছে তুলতে হতো। কিন্তু পনি কেবলই ঘ্যানর ঘ্যানর করতে থাকতো বক্সিং লড়বার কথা বলে। শেষটায় ওর মা বিরক্ত হয়ে কড়া একটা ধমক দিয়ে থামিয়েছিলেন ওকে।

উফ্! আবার ঢুলতে শুরু করেছে সে। আর একটু হলেই সিট থেকে গড়িয়ে পড়ছিলো আর কি! কষে সে নিজের পায়ে চিমটি কাটতে শুরু করলো। আঙুল দিয়ে চিমটি কাটলো এমনভাবে যে পায়ে কালশিরে দাগ পড়ে গেলো। কিন্তু মনে হলো না কোনো ফল হচ্ছে। উল্টোদিকের সিটের বোতামগুলো গুনবার চেষ্টা করলো সে এবার। একদিক থেকে গুনে দেখলো চব্বিশটা। উল্টোদিক থেকে সে তেইশটার বেশি কিছুতেই গুনতে পারলোনা। সিটের উপর ঠেস দিয়ে সে ভাবতে চাইলো এমন হিজিবিজি হয়ে যাচ্ছে কেন গোনাটা—তারপর—তারপর সে তলিয়ে গেলো গভীর ঘুমে।

দুরন্ত দুঃস্বপ্ন

এমিলের হঠাৎ মনে হলো, ট্রেনটা যেন শুধু বৃত্তের মতো একটি পথে ঘুরছে। ছেলেদের খেলনা-রেলগাড়ি যেমন মেঝেয় ঘুরে চলে ঠিক তেমনি। জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখলো সে, ইঞ্জিনটা ট্রেনটাকে টেনে নিয়ে ঘুরে চলেছে আর ক্রমশ সবচেয়ে পেছনের কামরার কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। মনে হলো তার, ইঞ্জিনটা যেন ইচ্ছে করে করছে এমন, বাচ্চা কুকুর নিজের লেজ ধরার জন্য যেমন করে। রেল লাইনের কালো গোল চাকাটার মধ্যে সে দেখতে পেলো নানা ধরনের গাছ, কাঁচের তৈরি হাওয়া-কল একটি আর প্রায় দু'শ তলার উঁচু একটা বাড়ি। কটা বাজে দেখার জন্য এমিল ঘড়িটা পকেট থেকে বের করার চেষ্টা করলো। ক্রমাগত টেনেই চললো সে ঘড়িটা। অবশেষে দেখে বাড়ির বসার ঘরের বড় ঘড়িটাই বের করে আনছে সে। ঘড়িটার উপর লেখা, ঘন্টায় ১৫০ মাইল। বিপদ ঃ মেঝেয় থুতু ফেলো না।" আবার জানালা দিয়ে মুখটা বের করে দেখলো সে—ইঞ্জিনটা শেষ কামরাটাকে প্রায় ধরে ফেললো বুঝি। দু'টোই ক্রমশ এগিয়ে আসছে কাছাকাছি। যে-কোনো মুহূর্তেই এখন ধাক্কা লাগতে পারে দু'টোয়। এভাবে চুপচাপ বসে থেকে ধাক্কা লাগার অপেক্ষা করতে পারে না সে। দরোজা খুলে সাবধানে পা-দানিতে নামলো সে। তারপর তার উপর দিয়ে এগিয়ে চললো ইঞ্জিনের দিকে। মনে হলো তার, রেলের ড্রাইভার হয়তো বা ঘুমিয়ে পড়েছে।

যাবার সময় সে একে একে প্রত্যেকটি কামরার জানালা দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি উঁকি মেরে যেতে লাগলো। সব কামরা ফাঁকা। আসলে গোটা ট্রেনে সে আর চকোলেট দিয়ে তৈরি বৌলার টুপি-পরা একজন লোক ছাড়া অন্য কেউ নেই। এমিল দেখলো, টুপির একটা ধার ভেঙে লোকটা খাচ্ছে। জানালায় টোকা দিয়ে ইঞ্জিনের দিকে সে আঙুল দিয়ে দেখালো। কিন্তু লোকটা একটু হেসে আর এক টুকরো চকোলেট ভেঙে নিজের পেট চাপড়ে বোঝাতে চাইলো চকোলেট খেতে কী দারুণ মজা।

অবশেষে ইঞ্জিনের কয়লা রাখার জায়গায় পৌঁছে ড্রাইভারের কাছে যাবার জন্য এমিল খুব কষ্ট করে উপরে উঠলো। ড্রাইভার বসেছিলো ঘোড়ার-গাড়ির চালকের আসনে। একহাতে লাগাম আর অন্য হাতে চাবুক নিয়ে বসে আছে সে—যেন ট্রেনটা টানছে ঘোড়ায়। আর সত্যি তাই। ন'টা ঘোড়া জুড়ে দেয়া হয়েছে ইঞ্জিনের সাথে। তাদের খুরে রুপোলি গোলাকার নাল। লাইনের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে তারা আর কোরাস করে গাইছে খুব চলতি একটা গান।

লোকটাকে ঝাঁকি দিয়ে এমিল চেঁচিয়ে বললো, "থামাও, থামাও—নইলে অ্যাক্‌সিডেন্ট হবে এখুনি।" তারপর তাকিয়ে দেখলো ঝাঁকাচ্ছে সে সার্জেন্ট ইয়েশ্‌কে-কে! কটমট করে ইয়েশ্‌কে দেখলেন তাকে, গমগম করে উঠলো তাঁর গলার স্বর।

"গ্রান্ড ডিউকের মুখে খড়ি দিয়ে গোঁফ এঁকেছিলো কে ?"

"আমি", এমিল স্বীকার করে নিলো।

"আর কারা ছিলো তোমার সাথে ?"

"বলবো না আমি।"

"তা'হলে এই গোল-পথে আমরা শুধু ঘুরতে থাকবো।" বলেই সার্জেন্ট চাবুক হাঁকালেন ঘোড়াগুলোর উপর। পিছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে উঠলো তারা, তারপর সবশেষের কামরাটার দিকে ছুটতে লাগলো আগের চেয়েও জোরে। আর সেই কামরার ছাতে বসে আছেন মিসেস জ্যাকব। ভয়ে মুখটা তাঁর মরার মতো শাদা। ঘোড়াগুলোর দিকে তিনি তাঁর জুতোজোড়া নাড়াচ্ছেন, আর তারা তাঁর পায়ের আঙুলগুলো চিবোচ্ছে বেশ মজা করে।

"আপনি যদি থামেন, গোটা একটা পাউন্ড দেবো আপনাকে," এমিল চেঁচিয়ে বললো।

"বাজে কথা বলো না হে ছোকরা," ভূতে-পাওয়া লোকের মতো ঘোড়াগুলোকে চাবকাতে চাবকাতে চেঁচিয়ে উঠলো ইয়েশ্‌কে। এমিল সহ্য করতে পারলো না আর। ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়লে সে। ঢালু জায়গাটার দিকে গড়িয়ে পড়বার সময় প্রায় বিশবারের মতো ডিগবাজি খেলো এমিল। কিন্তু জখম হলো না একটুও। উপরে ট্রেনের দিকে তাকিয়ে পড়ে রইলো সে কিছুক্ষণ। সেটাও দাঁড়িয়ে পড়েছে আর ঘোড়া নয়টি তাকে দেখবার জন্য ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে। সার্জেন্ট ইয়েশ্‌কে লাফিয়ে উঠলেন, ঘোড়াগুলোকে চাবুক মেরে বললেন, "ওর পেছনে দৌড়াও, ওর পেছনে।" সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ন'টি লাইন থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এলো আর ঢালু জায়গা দিয়ে ছুটে আসতে লাগলো এমিলের দিকে। পেছনে ট্রেনের কামরাগুলো রবারের বলের মতো লাফাতে লাগলো।

চিন্তা করার জন্য এমিল অপেক্ষা করলো না। দু'পায়ের সমস্ত জোর দিয়ে দৌড়ে চললো সে—ঝোপঝাপ, গাছ আর ছোটো একটা খাল পেরিয়ে সামনের উঁচু বাড়িটার দিকে। দৌড়াতে দৌড়াতে বার বার ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে পেলো ট্রেনটা তখনো তেড়ে আসছে তার পেছন পেছন। সোজা গাছগুলোর উপর দিয়ে চলে এলো সেটা। দেশ্‌লাই-এর কাঠির মতো ভেঙে গেলো সেগুলো। খাড়া রইলো শুধু বিরাট একটি ওক গাছ। আর সেটির সবচেয়ে উঁচু ডালটায় বসে আছেন মিসেস জ্যাকব। বাতাসের সাথে সাথে ডালপালার সঙ্গে সঙ্গে দুলছেন তিনিও আর জুতো-জোড়া পরতে পারছেন না বলে কাঁদছেন।

দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়িটার একপাশে বিরাট কালো দরোজাটা দিয়ে ঢুকে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে এলো এমিল। তারপর দাঁড়ালো সে। এমন একটা নির্জন জায়গা খুঁজছিলো সে যেখানে কিছুক্ষণ শুয়ে ঘুমোনো যায়। অসম্ভব ক্লান্ত সে, কাঁপছে সমস্ত শরীর—কিন্তু মুহূর্তের জন্যও দাঁড়াতে ভরসা পেলো না সে। ততক্ষণে বাড়িটার মধ্যে দিয়ে ট্রেনটা ছুটে আসতে শুরু করেছে একেবারে তার পেছন পেছন।

বাড়িটার বাইরের দেয়াল ধরে আগুন থেকে রেহাই পাবার জন্য তৈরি লোহার সিঁড়িটা উপরে উঠে গেছে। এক সেকেন্ডও নষ্ট না করে এমিল সেটি ধরে উঠতে লাগলো। ভাগ্যিস্ জিমন্যাস্টিকস্ সে ভালো পারতো। উঠতে উঠতে বাড়ির তালাগুলো সে গুনে চললো—কিন্তু পঞ্চাশ তলা পর্যন্ত না উঠে পেছনের দিকে ফিরে তাকালো না সে। মাথাটা ঘুরিয়ে এমিল নিচের দিকে তাকালো—গাছগুলোকে খুব ছোট দেখাচ্ছে আর হাওয়া-কলটাতো চেনাই যাচ্ছে না। এবার তার আঁতকে ওঠার পালা। চেয়ে দেখলো ট্রেনটাও উঠে আসছে উপরের দিকে—সিঁড়িটা যেন রেল-লাইন আর কি! যতোটা সম্ভব তাড়াতাড়ি সে উঠতে লাগলো। একশো, একশো কুড়ি, একশো চল্লিশ, একশো ষাট, একশো আশি, একশো নব্বই—দু'শো তলায় সে উঠে এলো। সেটাই ছাত। ছাতে পা দিয়েই সে ভাবতে

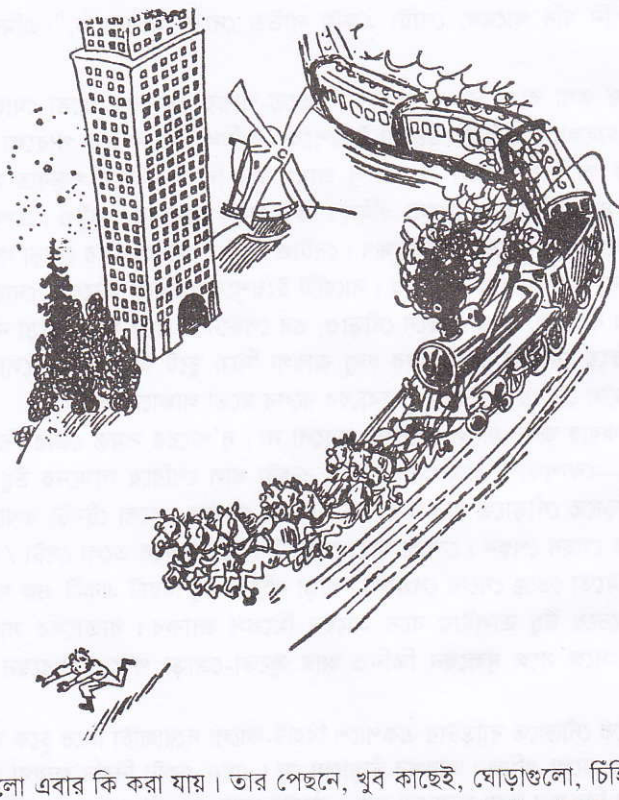

শুরু করলো এবার কি করা যায়। তার পেছনে, খুব কাছেই, ঘোড়াগুলো, চিঁহি-চিঁহি করে ডাকছে। ছাতের অপর পাশে ছুটে গেলো সে। তারপর পকেট থেকে রুমালটা বের করে ঝাঁকাতে শুরু করলো। ছাতের অপর পাশ ঘেঁষে উঠে আসা ঘোড়াগুলোকে দেখতে পেলো সে—পেছনে ঝন্ ঝন্ ঠং ঠং করে আসছিলো ট্রেনটা। অমনি মরিয়া হয়ে হাতের

রুমালটাকে প্যারাশুটের মতো মাথার উপর খুলে ধরে ঝাপ দিলো সে শূন্যে। ট্রেনটার চিমনির সারি ভেঙে ফেলার শব্দ শুনলো সে। তারপর আর কিছুই দেখতে বা শুনতে পেলো না। মাঠের মাঝখানে ধপ্ করে গিয়ে পড়লো। ভীষণ শ্রান্ত সে। কিছুক্ষণ চোখ বুজে স্থির হয়ে শুয়ে রইলো। সেই মুহূর্তের প্রশান্তি যেন মধুর স্বপ্নের মতো। কিন্তু ভয়ের ভাবটা কাটে নি তার। ছাতের উপর কি ঘটছে দেখবার জন্য চোখ খুলতে হলো তাকে। অমনি দেখতে পেলো সে, ঘোড়া নয়টি ছাতা খুলছে! সার্জেন্ট ইয়েশ্কে-এর হাতেও একটি ছাতা—সেটি নাড়িয়ে তাড়িয়ে আনছেন ঘোড়াগুলোকে। তাদের বিশাল শরীর খাড়া হয়ে উঠলো। তারপর ওরা দারুণ একটা লাফ মারলো। তখনো ট্রেনটা টানছে তারা। ভাসতে ভাসতে নামতে লাগলো ট্রেনটা। এমিল যেখানে শুয়ে আছে তার কাছাকাছি আসতে আসতে বড় হয়ে উঠলো সেটি। চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে সোজা মাঠের মধ্য দিয়ে কাঁচের হাওয়া-কলটার দিকে সে ছুটলো। আর হাওয়া-কলের স্বচ্ছ কাঁচের দেয়ালের ভেতর দিয়ে অবাক হয়ে সে দেখতে পেলো তার মা মিসেস আগুস্টিনের চুল ধুইয়ে দিচ্ছেন। "প্রভুর কী দয়া," ভাবলো সে, তারপর পেছনের দরোজা দিয়ে দৌড়ে ঢুকলো ভিতরে।

"মা-মণি কি করবো আমি?" চেঁচিয়ে বললো এমিল।

"কি হয়েছে বাছা?" নির্বিকারভাবে নিজের কাজ করতে করতে তার মা জিজ্ঞেস করলেন।

হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললো, "দেখো অই দেয়ালটার মধ্যে দিয়ে।"

মাথা ঘুরিয়েই মিসেস টিশবাইন দেখলেন মাঠে নেমে ঘোড়াগুলো আর ট্রেনটা ভীষণ বেগে হাওয়া-কলের দিকে ছুটে আসছে।

দারুণ অবাক হয়ে বলে উঠলেন তিনি, "আরে, এ যে সার্জেন্ট ইয়েশ্কে!"

এমিল বললো, "হ্যাঁ, আমাকে উনি সব জায়গায় ধাওয়া করে আসছেন।"

"কেন, কি করেছিস্ তুই?" প্রশ্ন করলেন তিনি।

"কয়েকদিন আগে গ্র্যান্ড ডিউক চর্লস্-এর মূর্তিটার মুখে লাল একটা নাক আর কালো গোঁফ এঁকে দিয়েছিলাম আমি।"

মিসেস আগুস্টিন হাসতে হাসতে বললেন, 'মুখে না এঁকে আর কোথায় গোঁফ আকবে তুমি ?"

"আর কোথাও নয় নিশ্চয়! কিন্তু উনি জানতে চান আর কে কে ছিলো আমার সঙ্গে," বললো এমিল।

"আমি কিন্তু সে-কথা বলবো না।"

তার মা এবার বললেন, "ঠিক কথাই তো। তা বানিয়ে বানিয়ে বলবিনে কখনো। কিন্তু কি যে করি এখন?"

মিসেস আগুস্টিন বললেন, "ইঞ্জিনটা চালু করে দিন, মিসেস টিশবাইন।"

টেবিলের পাশে একটা হাতলে এমিলের মা চাপ দিতেই হাওয়া কলের চারটে পাখা ঘুরতে শুরু করলো। সূর্যের আলো পড়ছিলো কাঁচের সে পাখাগুলোয়। ঘোড়াগুলো কাছে আসতেই রোদের ঝিলিক ঠিকরে পড়ে চোখগুলো ওদের বাঁধিয়ে দিলো। আর এক পাও এগুতে চাইলো না ওরা। সার্জেন্ট ইয়েশ্‌কে এমন জোরে ধমকাতে লাগলেন যে কাঁচের দেয়ালের ভেতর দিয়েও এমিলরা তা শুনতে পেলো। ঘোড়াগুলো নড়লো না আর কিছুতেই।

মিসেস আগুস্টিন বললেন, "ব্যস্‌, কিছু আর করতে হবে না। এবার আপনি চুলগুলো আমার ধুয়ে দিন তো। এমিলের আর কোনো ভয় নেই।"

মিসেস টিশবাইন নিজের কাজ শুরু করলেন আবার। কাঁচের একটা চেয়ারে বসে এমিল শিস দিতে লাগলো। হেসে বললো সে, "কী যে ভালো লাগছে এখন। তুমি এখানে আছো জানলে অই ভয়ঙ্কর আকাশ-ছোঁয়া বাড়িটায় আমি কখনো উঠতাম না।"

তার মা বললেন, "স্যুটটা ছিঁড়ে আনিস নি, আশা করি। আচ্ছা, সেই নোটগুলো কোথায়? পকেটে আছে তো?" কথাগুলো শুনে এমিল এমন ভীষণ চমকে উঠলো যে ধপ্‌ করে পড়ে গেলো সে সিট থেকে। আর সাথে সাথেই ঘুম ভেঙে গেলো তার।

পিছু নেয়া হলো শুরু

ট্রেনটা সবে একটা স্টেশন ছেড়ে যাচ্ছে এমন সময় এমিলের ঘুম ভাঙলো। দেখলো সে নিজে মেঝেতে শুয়ে। ভারী ভয় লাগছে তার। ঘুমিয়ে পড়েছিলো সে আর তখন গড়িয়ে পড়েছে সিট থেকে—সে ভাবলো। কোনো একটা কারণে বুকের ভেতরে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে তার। প্রথমে মনে করতে পারলো না সে কোথায় আছে। পরে আস্তে আস্তে সব কথা মনে পড়লো। বার্লিনে যাবার জন্য একটা ট্রেনে চড়েছিলো সে—এটা ঠিক। বৌলার টুপি পরা এক ভদ্রলোক ছিলেন সে কামরায়—তিনিও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

বৌলার টুপির সেই ভদ্রলোক! তাঁর কথা মনে হতেই এমিল সচকিত হয়ে উঠলো। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসলো সে। চলে গেছে লোকটা। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে এমিল কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো। তারপর অভ্যেস মতো প্যান্ট আর কোট থেকে ধুলো ঝাড়তে শুরু করলো—আর ধুলো ঝাড়তে গিয়েই মনে পড়লো তার নোটগুলোর কথা। ঠিকমতো আছে তো? হাত দিয়ে ছুঁয়ে পরখ করার সাহস হলো না তার—পাছে দেখে ওগুলো নেই। দরোজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো সে, আর আঙুল তুলে দেখবার জন্য অধীর হয়ে উঠলো। সেই সিটটার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলো যেখানটায় গ্রুন্ডআইস নামের এক ভদ্রলোক বসেছিলো, ঘুমিয়ে পড়েছিলো আর নাক ডাকাচ্ছিলো। অথচ গ্রুন্ডআইস এখন হাওয়া।

এমিল যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলো তখন লোকটা ট্রেন থেকে নেমে গেছে বলেই যে দুনিয়া ওলট-পালট হয়ে যাবে এমন চিন্তা করা বোকামি। এমিল ফ্রিয়েডরিশ্ স্টেশন পর্যন্ত যাবে একথা সত্যি। কিন্তু তাই বলে সব যাত্রীই যে সেখানে যাবে এমন তো কোনো কথা নেই। অবশ্যই এমন কোনো কথা থাকতে পারে না। সেতো কোটের লাইনিং-এর নিচে খামে-ভরা নোটগুলো পিন দিয়ে আঁটকে রেখেছিলো। নিশ্চয়ই নিরাপদে আছে সেগুলো। ডান দিকের ভিতরকার পকেটে হাত দিলেই তো.... ধীরে ধীরে হাতটা চলে গেলো ভেতরের দিকে... তারপর হাতড়াতে লাগলো সে।

পকেট খালি। নোটগুলো নেই।

তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলো সে পকেটটা। পাগলের মতো অন্য পকেটগুলোও হাতড়াতে লাগলো। হাত বুলিয়ে দেখলো কোটের উপর—কিন্তু কোনো কিছুই খস্-খস্ করে উঠলো না। নোটগুলো সত্যিই আর নেই। পাগলের মতো শেষবার ভিতরকার পকেটগুলো হাড়াতে হাতড়াতে সে চেঁচিয়ে উঠলো। আলপিনটা ছিলো সেখানে, সেটা আঙুলে বিঁধে গেলো। হাতটা বাইরে নিয়ে এসে দেখলো আঙুলে এক ফোঁটা লাল রক্ত।

রুমাল দিয়ে আঙুলটা জড়িয়ে নিলো সে। এক ফোঁটা চোখের পানি গড়িয়ে পড়লো তার নাকের পাশ দিয়ে। আলপিন বিঁধেছে বলে নয়। এ ধরনের তুচ্ছ একটা ব্যাপারে তার কান্না আসে না। এই তো দিন পনেরো আগে ল্যাম্প-পোস্টের সাথে এমন জোরে ধাক্কা লেগেছিলো তার যে আর একটু হলে সেটাই উপড়ে যেতো। এখনো কপালে তার কালো দাগ আছে। কিন্তু সে কাঁদে নি ওতেও।

না। চোখের জল বেরিয়েছে শুধু টাকাগুলোর জন্য আর মার কথা মনে পড়ায়। তোমরা বুঝতে পারবে সেটা। বার্লিনে নিয়ে যাবার জন্য দেয়া ওই সাত পাউন্ড জমাতে অনেক মাস লেগেছে তার মার। সে জানতো সব—অথচ ট্রেনে উঠেই কিনা সে ঘুমিয়ে পড়লো। যখন ঐসব আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখছিলো সে তখনই ঐ লোভী লোকটা চুরি করেছে নোটগুলো। যে কোনো লোকেরই ওতে চোখে পানি বেরুবার কথা। কি করতে পারে সে এখন? বার্লিনে পৌঁছে নানীকে সে কি বলবে, "এসেছি আমি। কিন্তু আগেই আপনাকে বলে রাখি টাকা-পয়সা কিছুই নিয়ে আসি নি। আমার বাড়ি ফিরে যাবার ভাড়াটাও, এমন কি, আপনাকে দিতে হবে।"

এটা সে করতে পারবে না কিছুতেই। নোটগুলো সত্যিই হারিয়ে গেছে। নানী আর এক পেনিও পাবেন না ওখান থেকে। এরপর সেখানে গিয়ে কেমন করে থাকবে সে? আবার বাড়িও ফিরতে পারবে না। এমন বিশ্রী একটা ঘটনার জন্য দায়ী জঘন্য একটা লোক, যে কিনা চকোলেট খেতে দেয়, টাকাকড়ি চুরি করার জন্য আবার ঘুমের ভান করে। সত্যি সত্যি এটা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

কিন্তু অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এমিল সামলে নিলো নিজেকে, চোখের জল মুছে চারদিকে তাকালো। সে চেন টানতে পারে। ট্রেনটা তাহলে থামবে আর কি হয়েছে সেটা দেখার জন্য গার্ড আসবেন।

তিনি প্রশ্ন করবেন, "কি ব্যাপার?"

তখন এমিল বলবে তাঁকে, "আমার টাকাগুলো সব চুরি হয়ে গেছে।"

গার্ড আর কি বলবেন, বলবেন হয়তো, "পরের বার সাবধানে যেয়ো।" তারপর নিশ্চয়ই এমিলের নাম আর ঠিকানা জানতে চাইবেন।

আরও বলবেন, "তোমার মার কাছে চিঠি লিখতে হবে। বিনা প্রয়োজনে চেন টানবার জন্য ফাইন পাঁচ পাউন্ড। এই পাঁচ পাউন্ড তাঁকে দিতে হবে। যাও, এখন ট্রেনে উঠে পড়ো—জলদি।"

যাত্রীরা যাতে এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত যেতে পারে এজন্য এক্সপ্রেস ট্রেনে বারান্দা থাকে। এটা সে-রকম ট্রেন হলে এমিল সোজা গার্ডের কামরায় গিয়ে চুরির কথা জানিয়ে আসতে পারতো। কিন্তু এ ট্রেনটা চলে হাই তুলতে তুলতে। কোনো বারান্দা নেই এতে। অতএব পরের স্টেশনে ট্রেন না থামা পর্যন্ত কিছুই করার নেই তার। ততক্ষণে বৌলার টুপি পরা লোকটা ট্রেন থেকে অনেক দূরে চলে যাবে। কখন যে লোকটা ট্রেন থেকে নেমেছে এমিলের তা জানা নেই। ক'টা বাজে? ভাবলো এমিল।

আর বার্লিনে যে কখন পৌঁছবে কে জানে! জানালা দিয়ে সে দেখতে পেলো ফ্ল্যাট-বাড়ি, বাগান-ঘেরা বড় বাড়ি, আর বহু ময়লা লালচে চিমনি। এটাই বুঝিবা বার্লিন! পরের স্টেশনে গার্ডকে সে খুঁজে বার করবে আর যা যা ঘটেছে সব জানাবে। কিন্তু তাহলে তারা নিশ্চয়ই পুলিশকেও জানাবে।

হায়-হায়! পুলিশের খপ্পরে একবার পড়লে সার্জেন্ট ইয়েশ্‌কে জানতে পারবেন। আর তখন তিনি গ্র্যাণ্ড ডিউকের মূর্তির ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তুলবেন। বলবেন, "আঃ। এমিল টিশবাইন নামের এই ছোকরাটার উপর আমার সন্দেহ ছিলো। প্রথমত খড়ি দিয়ে নয়স্টডট্ শহরের চমৎকার একটা মূর্তির মুখ নষ্ট করে দিয়েছে সে। তারপর বলছে বার্লিন যাবার পথে চুরি গেছে তার সাত পাউন্ড।

আদতে তার কাছে সাত পাউন্ড ছিলো কিনা কে জানে! আমার তো মনে হয়, যে ছেলে মূর্তির মুখে খড়ি বোলাতে পারে—সে অনায়াসে এমন একটা গল্পও ফেঁদে বসতে পারে। নোটগুলো কোথাও পুঁতে রাখতে পারে সে—এমন কি গিলে ফেলাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। চোরের খোঁজ করবার জন্য আপনি সময় নষ্ট করবেন না। চোর যদি কেউ হয়—তাহলে সে এমিল টিশবাইন নিজে। ইন্‌স্‌পেক্টর, আমার পরামর্শ হচ্ছে—তাকে এক্ষুনি গ্রেপ্তার করুন।

ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সাহায্য নেয়ার জন্য এমন কি সে পুলিশের কাছেও যেতে পারছে না।

উপরের র‍্যাক থেকে স্যুটকেশটা টেনে নামালো এমিল, তারপর টুপিটা পরে নিলো। আলপিনটা আবার কোটের কলারের ভাঁজে গেঁথে নিয়ে নামবার জন্য তৈরি হলো। এরপর কি করবে কিছুই জানে না সে। কিন্তু এই কামরায় বসে থাকা তার পক্ষে এখন আর সম্ভব নয়। ট্রেনটা আস্তে আস্তে থেমে এলো। জানালা দিয়ে দেখতে পেলো সে সারি সারি ঝকঝকে রেল লাইন। প্ল্যাটফরমও অনেক। কামরার সাথে সাথে পোর্টাররা দৌড়াচ্ছে। যাত্রীদের মাল বয়ে নিয়ে যাবার জন্য ওরা এগিয়ে আছে এক পা। তারপর থেমে গেল ট্রেনটা।

প্ল্যাটফরমের বাইরের দিকে বড় বড় অক্ষরে ইস্টিশনের নাম লেখাঃ "জুলজিক্যাল গার্ডেন্‌স।" কামরার দরোজাগুলো খুলে গেলো, নামলো অনেক লোক। অনেকের বন্ধুবান্ধবরা অপেক্ষা করছিলো—তারা হাত নাড়াতে লাগলো, ডাকাডাকি করতে লাগলো একজন আর একজনকে।

গার্ডকে খোঁজার জন্য এমিল জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে বাইরে দেখতে লাগলো। তারপর যে সব যাত্রী বেরিয়ে যাচ্ছিলো তাদের ভিড়ের মধ্যে সহসা সে বৌলার টুপি পরা একজনকে দেখলো। অমনি তার মনে হলো-"ওই তো! মিঃ গ্রুন্ডআইস।"তাহলে ট্রেন থেকে আগে নামে নি সে! এমিল যখন ঘুমোচ্ছে তখন শুধু কি সে কামরা বদল করেছে? আর কোনো কিছু না ভেবে এমিল নেমে এলো প্ল্যাটফরমে। মাল রাখার তাক থেকে ফুলগুলো নামাতে সে ভুলে গিয়েছিলো। চোখের পলকে আবার ট্রেনে উঠে সেগুলো নামিয়ে আনলো সে। এক হাতে ফুল আর অন্য হাতে স্যুটকেসটা নিয়ে সে ছুটে চললো বাইরে বেরুবার পথের দিকে। ট্রেন থেকে যারা নেমেছে বেরুবার পথের মুখে তাদের

সাংঘাতিক ভিড়, নড়া-চড়া করাও সম্ভব হচ্ছে না। ভিড়ের মধ্যে এমিল আর বৌলার টুপিটা দেখতে পেলো না। লোকের পা মাড়িয়ে, স্যুটকেশে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো সে। তারপর আবার তার চোখে পড়লো সেই বৌলার টুপি। এবার আর একটা নয়—একেবারে দু'টো।

স্যুটকেসটা খুব ভারী। তাই তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছে না এমিল। কিন্তু সেটা কোথাও রেখে লোকটার পেছনে দৌড়ালে—ওটা চুরি হয়ে যেতে পারে। যদ্দূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সে এগুতে লাগলো। অবশেষে বৌলার টুপি দু'টির প্রায় একই সমান্তরালে পৌঁছে গেলো সে। কিন্তু কোনটি আসল? একজনকে মনে হলো বেজায় রকম বেঁটে। রেড ইন্ডিয়ানরা যেভাবে শিকারের পিছু নেয় তেমনি এঁকে-বেঁকে যাকে খুঁজছে তার পিছু নিলো এমিল। সে দেখলো, লোকটা বেরুবার পথ পেরিয়ে গেলো। ভীষণ রকম তাড়া যেন তার।

মনে মনে সে বললো, "দাঁড়াও বেটা পাজি চোর, দেখাচ্ছি তোমাকে মজা। ঠিকই তোমাকে ধরে ফেলবো।"

টিকিটটা দিয়ে, স্যুটকেসটা হাত বদল করে, ডান বগলের নিচে শক্ত করে ফুলগুলো চেপে ধরে দৌড়ে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

ভাবলো সে, "এবার, এবার কেমন—!"

সতর্ক চোখে ট্রাম পাহারা

"ফিরিয়ে দিন আমার নোটগুলো"—লোকটার কাছে সোজা ছুটে গিয়ে কথাগুলো এমনভাবে বলতে পারলেই অবশ্য সুখী হতো এমিল। কিন্তু গ্রুন্ডআইসকে দেখে তেমন লোক বলে মনে হয় না যে ভদ্রভাবে উত্তরে বলবে, "এই নাও খোকা। খুশি মনেই আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। খুব দুঃখিত আমি। এমন কাজ আর কখনো করবো না।" না—ব্যাপারটা অতো সহজে শেষ হবে বলে মনে হয় না।

এখন সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, লোকটাকে যখন পাওয়াই গেছে, তখন তাকে চোখের আড়াল হতে না দেয়া। মোটা এক ভদ্রমহিলার আড়াল থেকে লোকটার উপর কড়া নজর রাখতে লাগলো এমিল। মোটা মহিলাটি যাচ্ছিলেন সেদিকেই। বৌলার টুপি পরা লোকটার কাছে যতই এগিয়ে এলো ততই তার একমাত্র ভাবনা হলো ঃ এবার কি হবে। বাইরে যাবার প্রধান ফটকের কাছে পৌছে লোকটা একবার পেছন ফিরে তাকালো, ভাবখানা এমন যেন কাউকে খুঁজছে সে ভিড়ের মধ্যে। এমিল সাবধানে তার চোখ এড়িয়ে গেলো। মোটা ভদ্রমহিলাও ক্রমশ ফটকের কাছে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এমিল একবার ভাবলো, তিনি কি তাকে সাহায্য করবেন? কিন্তু তার কথা তিনি বিশ্বাস নাও করতে পারেন। আর যদি তিনি বিশ্বাসও করেন তা'হলে চোর বেটা এ কথা বললেই যথেষ্ট ঃ "ম্যাডাম, বাচ্চাদের কাছ থেকে টাকা চুরি করার মতো গরিব দেখাচ্ছে কি আমাকে?" তখন তো সবাই এমিলের দিকে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে বলবে, "কি লজ্জার ব্যাপার! এ রকম পুঁচকে একটা ছেলে লোকের সম্পর্কে যা-তা গল্প বানিয়ে বেড়ায়। আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো কি যে হচ্ছে!" কথাটা ভাবতেই ভয়ে এমিলের দাঁতে দাঁত লেগে গেলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে নেমে গেলো রাস্তায়। লোকটা কোথায় যায় সেটা দেখার জন্য এমিল ছুটে এগিয়ে গেলো খানিকটা। হাতটা ব্যথায় টনটন করছে। বেজায় ভারী স্যুটকেসটা। তাকিয়ে দেখলো সে, চোর মশায় ধীরে ধীরে রাস্তা পার হচ্ছে। একবার পেছন ফিরে তাকালো সে, তারপর যেন নিশ্চিন্ত হয়ে এগুতে লাগলো।

১৭৭-নম্বরের একটা ট্রাম এসে থামলো ইস্টিশানের উল্টোদিকে। ট্রামটার দু'টো কামরা। খানিকটা ইতস্তত করে লোকটা সামনের কামরাটায় উঠে একটা জানালার পাশে বসলো।

ঝট্ করে স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে এমিল মাথাটা নিচু করে রাস্তায় নামলো। সে যখন ট্রামটার কাছে পৌছলো তখন সেটা ছাড়তে যাচ্ছে। কোনো রকমে স্যুটকেশটা গুঁজে দিয়ে ঠেলাঠেলি করে উঠে পড়লো সে-ও। হাঁপাচ্ছে সে তখন, কিন্তু বিজয়ীর ভাব তার মনে।

কিন্তু এরপর কি? সে ভাবতে চাইলো। চলন্ত ট্রাম থেকে লাফ মেরে যদি পালিয়ে যায় চোরটা? তাহলে টাকাটা উদ্ধারের আর কোনো আশাই রইলো না। আবার তার পিছু নেয়ার অনেক ঝুঁকি, তার উপর এই স্যুটকেসটাও হয়েছে মহা ঝামেলা।

হর্ন বাজিয়ে, ব্রেক কষে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে নানা রকম মোটরগাড়ি। কখনো ডানদিকে, কখনো বা বামদিকে যাবার সঙ্কেত দেখিয়ে সেগুলো ঢুকে পড়ছে আশে-পাশের রাস্তাগুলোয়, আবার তাদের পেছনে ছুটে আসছে অন্য গাড়ি। কী যে শব্দ—বাপস্! ফুটপাথ দিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে লোক আসছে ক্রমাগত—দলের পর দল। প্রত্যেকবার বাঁক নিতেই ভ্যান আর লরি, ট্রাম আর দোতলা-বাস ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসছে বড় রাস্তায়। প্রত্যেক কোনায় রয়েছে খবরের কাগজের দোকান। লোকগুলো সর্বশেষ বড়-বড় খবর হেকে চলেছে অবিরাম। এমিল যেদিকে তাকায়— সেদিকেই ঝলমলে সব দোকান। কাচের জানালা দিয়ে চোখে পড়ছে সাজানো ফুল-ফল, বই, জামা-কাপড়, দামি সিল্কের অন্তর্বাস, সোনার হাতঘড়ি আর দেয়ালঘড়ি ইত্যাদি। সব বাড়ি যেন শুধু উপরের দিকে উঠছে আর উঠছে।

এই হচ্ছে তাহলে বার্লিন শহর, বাব্বা !!

এমিলের ইচ্ছে করছিলো দাঁড়িয়ে সবকিছু ভালো করে দেখতে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। যে লোকটার কাছে তার নোটগুলো, সে বসে আছে সামনের গাড়িতে। যে-কোনো মুহূর্তেই সে নেমে ভিড়ের মাঝে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। সে রকম একটা কিছু ঘটলে সবকিছু এখানেই চুকে-বুকে গেলো। গাড়ি-ঘোড়ার এমন জবরদস্ত ভিড়ে এমিল যে তার পিছু নিতে পারবে না—এ ব্যাপারে এমিলের কোনো সন্দেহ নেই। বৌলার টুপি-পরা লোকটা এর মধ্যে হয়তো নেমে গেছে। একথা ভেবে সে ভীষণ ঘাবড়ে গেলো। মাথাটা বের করে তাকে দেখবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। অন্ধের মতো কিছু না জেনেই এগোতে হবে তাকে। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। লোকটা নেমে গেছে না সামনের গাড়িতে রয়েছে এটাও জানতে পারছে না সে। এমন কি ট্রামটা যে কোথায় যাচ্ছে সেটাও সে জানে না। আর এদিকে, মনে পড়লো তার, ফ্রিয়েড্রিশ স্ট্রীট স্টেশনের ফুলের দোকানটার কাছে নানী এখন তার অপেক্ষা করছেন। তিনি যদি জানতেন তাঁর নাতি এই রকম বিপদের মাঝে ১৭৭ নম্বর এক ট্রামে একা ঘুরে বেড়াচ্ছে বার্লিন শহরে! জানতে পারলে কি বলতেন তিনি?

ঠিক তখুনিই এই প্রথমবারের মতো ট্রাম থামলো। এমিল সোজা তাকিয়ে রইলো সামনের কামরাটার দিকে। অনেকেই উঠলো, কিন্তু নামলো না কেউ। সিটের দিকে যেতে সবাই এমিলকে ঠেলে। সে পথ আটকে আছে বলে একজন গজ্‌গজ করে উঠলো।

তারস্বরে সে বললো, "তোমার মতো অন্য সবাই-ই তো বাড়ি যেতে চায়।"

ভিতরের দিকে কন্ডাক্টর ভাড়া আদায় করছিলো। সে ঘণ্টা বাজাতে ট্রাম আবার চলতে লাগলো। ধাক্কা খেতে খেতে এমিল এক কোণে পৌছলো। কে একজন তার পা মাড়িয়ে দিলো। তারপর, সহসা মনে পড়লো তার তো ভাড়া দেবার পয়সা নেই।

কন্ডাক্‌টর এগিয়ে আসছিলো তার দিকে। ভাবলো সে, ভাড়া দিতে না পারলে আমাকে নামিয়ে দেবে নিশ্চয়। তাহলে তো সর্বনাশ। সে তার চারপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো কেউ কি তার টিকেটের পয়সা ধার দেবে না! সবাই তার আপন আপন চিন্তায় ব্যস্ত। একজন খবরের কাগজ পড়ছে, অন্য দু'জন একটি বড় ব্যাঙ্ক-ডাকাতির আলোচনায় মগ্ন।

দু'জনের একজন বললো, "সুড়ঙ্গ দিয়ে ডাকাতরা ব্যাঙ্কে ঢুকেছিলো। সেটা তারা আগেই করে রেখেছিলো। তারপর সেফ্ ডিপোজিটের সবকিছুই নিয়ে এসেছে তারা। ব্যাঙ্কের লোকেরা তো বলছে হাজার হাজার পাউন্ড খোয়া গেছে।"

অন্যজন উত্তর দিলো, "সেফগুলোতে কি ছিলো তা প্রমাণ করা বেশ শক্ত হবে। সেগুলোর মধ্যে তারা কি রাখছে তা ব্যাঙ্ককে বলতে বাধ্য-বাধকতা নেই কোনো।

তার বন্ধু বললো, "আমার মনে হয়, লোকেরা হাজার হাজার পাউন্ডের হীরে ছিলো বলে দাবি করতে পারে। আসলে হয়তো রেখেছিলো তারা বেদরকারি কতকগুলো বন্ড কিংবা এনামেল করা চামচ।"

দু'জনেই এ নিয়ে হাসাহাসি করলো তারা।

"আমার কপালেও এই আছে।" এমিল ভাবলো নিজে নিজে। "কেউই বিশ্বাস করবে না যে, আমার কাছ থেকে মিঃ গ্রুন্ডআইস সাত পাউন্ড চুরি করেছে। সে বলবে, আমি বানিয়ে গল্প বলছি, আসলে সে নিয়েছে মাত্র আধা ক্রাউন। হায়রে পোড়া কপাল! কি ফ্যাসাদেই না পড়েছি!"

ততক্ষণে কন্ডাক্‌টর এমিল যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখানে পৌঁছে গেছে। চেঁচিয়ে বললো সে, "আর কার ভাড়া বাকি আছে?"

তার আশেপাশের লোকেরা সব পয়সা গুনে ভাড়া দিয়ে বদলে ফুটো-করা লম্বা কাগজের টিকিট নিয়ে নিলো। কন্ডাক্‌টর এমিলের কাছে এসে বললো, 'তোমার ভাড়া?"

"দেখুন, আমার টাকাকড়ি সব হারিয়ে গেছে।" এমিল বললো তাকে। অবশ্য সে প্রায় নিশ্চিত ছিলো যে, লোকটা তার কথা আদৌ বিশ্বাস করবে না।

"চুরি হয়ে গেছে—এ্যাঁ? অমন গল্প আগেও বহু শুনেছি। তা কদ্দূর যাওয়ার খায়েস তোমার?"

"আ-----আ----আমি ঠিক এখনো জানিনে," এমিল থমকে থমকে বললো।

"বেশ, পরেরবার গাড়ি থামলে নেমে গিয়ে ঠিক করে নাও কোথায় যাবে তুমি।"

"না----না----আমি তা করতে পারবো না!" এমিল কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, "আমাকে কিছুক্ষণ অন্তত থাকতে হবে। দয়া করে আমাকে থাকতে দিন।"

কন্ডাক্‌টর কঠিনভাবে বললো, "নামতে যখন বলেছি, নামতে তোমাকে হবেই। বুঝলে হে ছোক্‌রা?"

"উঃ কি জ্বালা! ছেলেটাকে একটা টিকিট দাও তো বাপু!" যে ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন তিনি পয়সা বের করে দিয়ে বললেন।

এমিল টিকিট পেয়ে গেলো। কন্ডাক্‌টর কিন্তু বলতে লাগলো, "আপনি বিশ্বাস করবেন না মশাই কত ছেলে যে রোজ এমন করছে। টাকা হারিয়ে গেছে বলে ভান করে তারা। আর যেই না আমি পেছন ফিরি—অমনি ওরা হাসতে শুরু দেয়। ওদের ধারণা, এটা একটা মজার ব্যাপার।" লোকটি বললো, "আমার মনে হয় না এই ছেলেটা সে রকম।"

"না —না। আমি সে রকম নই," কন্ডাক্‌টর ভিতরের দিকে চলে গেলে এমিল ভদ্রলোককে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো। "অনেক ধন্যবাদ স্যার।"

"ঠিক আছে," কথাটা বলেই ভদ্রলোক আবার খবরের কাগজে মুখ ডুবিয়ে দিলেন।

ট্রাম আবার দাঁড়ালো। বৌলার টুপি নেমে যাচ্ছে কিনা দেখবার জন্য এমিল ঘাড় বের করে দেখতে লাগলো। না, নামছে না সে।

ট্রামগাড়ি আবার চলা শুরু করলে এমিল খবরের কাগজ পড়তে-থাকা ভদ্রলোককে বললো, "অনুগ্রহ করে আপনার ঠিকানাটা আমাকে একটু দেবেন?"

"কেন?"

"আমি আবার টাকা পেলে আপনার পয়সাটা ফিরিয়ে দিতে চাই—স্যার! সপ্তাহ খানেক বার্লিনে থাকবো আমি। আপনাকে টাকাটা ফিরিয়ে দিতে পারবো। আমার নাম হচ্ছে এমিল টিশবাইন। আমি আসছি নয়স্টডট্ থেকে।"

ভদ্রলোক বললেন," এ নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে। ভাড়া দেয়া হয়ে গেছে—ব্যস্। তোমার কি আরো কিছু পয়সা দরকার?

"না—না, ধন্যবাদ স্যার!" এমিল ব্যস্ত হয়ে বললো।

"আমার আর পয়সার দরকার নেই।"

"তোমার যা ইচ্ছে," বলেই ভদ্রলোক আবার খবরের কাগজ পড়তে শুরু করে দিলেন।

ট্রাম চলছে। কখনো থামে। আবার চলে। এমিল আবিষ্কার করলো, চওড়া যে সুন্দর রাস্তাটা দিয়ে তারা যাচ্ছে সেটার নাম কাইজার অ্যাভিনিউ। কিন্তু সেটা যে কোন জায়গায় এ সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। চোর আছে সামনের কামরায়। আর তার মনে হলো চোরের দল যেন তাকে ঘিরে রেখেছে। মনে হলো তার, কারো যেন কিছুতেই কোনো উৎসাহ নেই। অচেনা এক ভদ্রলোক তার ভাড়া দিয়েছেন। তারপর আবার খবরের কাগজের মধ্যে ডুবে গেছেন। কেন যে তার কাছে পয়সা নেই এটা তিনি জানতেও চাইলেন না। এই বিরাট ব্যস্ত শহরের মধ্যে নিজেকে একেবারে তুচ্ছ মনে হলো এমিলের। তার কাছে যে পয়সা-কড়ি নেই, কিংবা সে যে কোথায় যাবে তা জানে না—এ নিয়ে যেন কারুরই কোনো মাথাব্যথা নেই। বার্লিনে তখন চল্লিশ লাখ লোক। এদের একজনও এমিল টিশবাইন কি করবে এ নিয়ে ভাবছে না। অন্যের বিপদে নিজের সময় নষ্ট করার কথা শহরের লোকেরা ভাবে না। তাদের নিজেদেরই হাজার রকমের ঝামেলা। কেবল মুহূর্তখানেকের জন্য তারা শুনতে পারে। এমনকি হয়তো বা দুঃখও জানায়। কিন্তু খুব সম্ভব মনে-মনে বলে, "দোহাই, আমাকে জ্বালিও না বাপু!"

নিজেকে অতোখানি একলা ভাবতে ভারী খারাপ লাগে। কপালে কি যে আছে— সে কথাই শুধু ভাবতে লাগলো এমিল।

ফুলের দোকানে দীর্ঘ প্রতীক্ষা

কাইজার অ্যাভিনিউ দিয়ে ১৭৭ নম্বর ট্রামে এমিল যখন অজানার দিকে চলেছে, তখন ফ্রিয়েড্‌রিশ্ স্ট্রীট স্টেশনে তার নানী আর খালাতো বোন পনি অপেক্ষা করছিলো। কথা মতো তারা দাঁড়িয়েছিলো ফুলের দোকানটার পাশে। ঘন ঘন দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছিলো তারা। ব্যাগ, স্যুটকেস, পার্সেল আর ফুলের তোড়া নিয়ে অনেক লোক বেরিয়ে গেলো তাদের পাশ কাটিয়ে। কিন্তু এমিলের আর দেখা নেই।

"মনে হয় এখন সে বেশ বড়-সড় হয়ে গেছে। আমাদের পাশ দিয়েই চলে গেছে সে আর আমরা তাকে চিনতে পারি নি," পনি বললো। বলতে বলতে সে তার ঝকঝকে নতুন বাই-সাইকেলটা একবার পেছনে—একবার সামনে ঠেলছিলো।

বাই-সাইকেলটা আসলে ইস্টিশানে আনার তেমন কোনো দরকার ছিলো না। কিন্তু আনবার জন্য সে এমন জিদ ধরেছিলো যে, শেষটায় নানীকে বলতে হয়েছিলো, "আচ্ছা, আচ্ছা, নিয়ে চল তাহলে বোকা মেয়ে কোথাকার!" এটা দেখে এমিলের চোখ দু'টো হিংসেয় কেমন জ্বল জ্বল করবে, সেটা ভাবতে গিয়ে তার হাসি আসছিলো খুব। সগর্বে সে বলে ফেললো, "বাজি রেখে বলতে পারি, এমন চমৎকার একটা বাইক তার চেনা-জানা কারুরই নেই।"

নানীর দুশ্চিন্তা কিন্তু ক্রমে বাড়তে লাগলো। তিনি বললেন, "কি যে হলো ছেলেটার? ট্রেন নিশ্চয়ই এতোক্ষণে এসে গেছে। এখন তো ছ'টা বেজে কুড়ি মিনিট।" কিছুক্ষণ পর তিনি পনিকে পাঠালেন খবর নিয়ে আসতে। পনি অবশ্য বাই-সাইকেলটা সাথে নিয়েই গেলো।

ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা টিকেট কালেক্‌টারকে জিজ্ঞেস করলো পনি, "আচ্ছা, নয়স্টডট্ থেকে যে ট্রেনটা আসবার কথা সেটার কি হয়েছে বলতে পারেন? আজকে খুব লেট করছে সেটা, নয়?"

"নয়স্টডট্—নয়স্টডট্—" হাতের টিকেট-পাঞ্চটা দোলাতে দোলাতে কি যেন ভাবলো লোকটা। তারপর বললো, "হ্যাঁ, ৬টা ১৭ মিনিটে। সেটাতো এসে গেছে কিছুক্ষণ আগে।"

"ওমা! আপনি ঠিক বলছেন তো? নানী আর আমি সেই কখন থেকে ফুলের দোকানটার পাশে অপেক্ষা করছি আমার খালাতো-ভাই এমিলের জন্য। ওর তো এই ট্রেনেই আসার কথা।"

টিকেট কালেকটার বললো, 'তোমার কথা শুনে সুখী হলাম। তবে আমি ঠিকই বলেছি।"

"আপনার এতে সুখী হবার কিছু আছে বলেতো আমার মনে হয় না," বলতে বলতে পনি বাইকের বেলটা এমন জোরে চেপে দিলো যে সেটা হঠাৎ ক্রিং করে বেজে উঠলো।

টিকেট কালেকটার উত্তর না দিয়ে ওর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালো।

রেগে পানি বললো, "বেশ অদ্ভুত লোকতো আপনি। গুডবাই।" কয়েকজন লোক কাছেই দাঁড়িয়েছিলো। পনির দিকে চেয়ে তারা হেসে উঠতেই টিকেট-কালেক্টকটর বিরক্ত হলো একটু। পনি বাই-সাইকেল নিয়ে ফুলের দোকানে ফিরে গেলো। বললো, "ট্রেন অনেক আগেই এসে গেছে, নানী।"

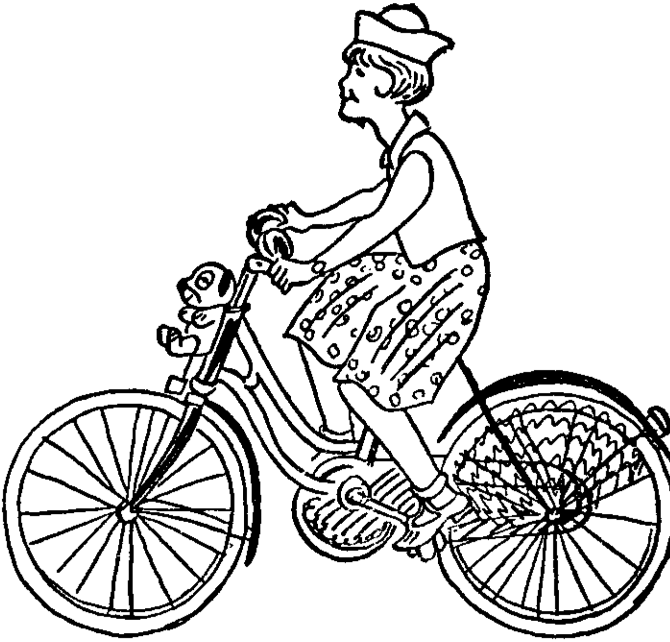

বৃদ্ধা নানী বললেন, "তা'হলে এমিলের হলোটা কি? আসতে না পারলে তার মা টেলিগ্রাম করতো নিশ্চয়ই। তোর কি মনে হয়, ভুল করে সে অন্য ইস্টিশানে নেমে গেছে ? আমরা তো সবকিছু খুঁটিয়ে লিখেছিলাম তাকে।"

"আমারো মনে হয় তাই হয়েছে," বেশ নিশ্চিতভাবেই বললো পনি। "ছেলেরা এক নম্বরের বোকা। বাজি রাখতে পারি আমি, এই কাণ্ডই করেছে সে।"

এমিল হঠাৎ দেখা দিতে পারে এই আশায় আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলো তারা। তারপর আর কিছু করার না থাকায় দাঁড়িয়ে রইলো আরো পাঁচ মিনিট।

অবশেষে পনি বললো, "এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো অর্থ হয় না। আচ্ছা, এখানে অন্য কোনো ফুলের দোকান নেই তো?

তার নানী বললেন, "যা, একবার দেখে আয়। তাড়াতাড়ি ফিরিস কিন্তু।"

পনি তার বাই-সাইকেল নিয়ে চারদিকে ঘুরে দেখলো। কিন্তু দ্বিতীয় আর ফুলের দোকান নেই আশেপাশে। জনাকয়েক কুলীকেও জিজ্ঞেস করলো সে। তারপর নিশ্চিত হয়ে ফিরলো। একমাত্র ফুলের দোকানটির পাশেই এতোক্ষণ অপেক্ষা করেছে তারা।

এসেই জানালো সে, "আর কোনো ফুলের দোকান নেই। থাকলে অবাক হয়ে যেতাম।—আর.... কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম তোমাকে। ও, হ্যাঁ—নয়স্টডট্ থেকে পরের ট্রেনটা আসবে আটটা তেত্রিশে। চলো এখন বাড়ি ফেরা যাক। তখনই বাইকটা নিয়ে আমি আসবো দেখতে। তখনো না এলে আমি চিঠি লিখে জানাবো তার সম্পর্কে কি ধারণা হয়েছে আমার।"

অত্যন্ত চিন্তিত মুখে নানী বললেন, "কিন্তু, ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না আমার কাছে। একেবারেই ভালো ঠেকছে না।" উত্তেজিত কিংবা চিন্তিত হলে একই কথা দু'দুবার বলা তাঁর স্বভাব।

"নানী, সাইকেলের হ্যান্ডেলে চেপে যাবে!" ধীরে ধীরে বাড়ি ফেরার সময় পনি প্রশ্ন করলো।

"কখনো না! যতোসব বোকার মতো কথা বলিস না।" বৃদ্ধা উত্তর দিলেন।

বোকামির কি পেলে তুমি এতে ? আর্থার জিক্‌লার-এর চাইতে মোটেই ভারী হবে না তুমি। সে তো প্রায়ই হ্যান্ডেলে চাপে।

"আর একবার যদি তার হ্যান্ডেলে চাপার কথা শুনি তাহলে তোর বাবাকে বলবো সাইকেলটা তোর কাছ থেকে একেবারে নিয়ে নিতে।"

"তোমার মনটা ছোটো, চটে গিয়ে পনি বললো। ১৫ নম্বর স্যুমান স্ট্রীটের বাসায় পৌঁছে দেখলো তারা, পনির বাবা-মা দু'জনেই অধীরভাবে অপেক্ষা করছেন। এমিল আসে নি শুনে তাঁরা অত্যন্ত দুর্ভাবনায় পড়লেন। মিঃ হেইমবোল্ড তখুনিই নয়স্টডটে টেলিগ্রাম করে দিতে চাইলেন। কিন্তু তারা কানেই তুললো না সে কথা।

"দোহাই তোমার!" তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "তার মা ভেবে ভেবে খুন হবে। তার চেয়ে আটটা নাগাদ আবার ইস্টিশানে গিয়ে দেখবো আমরা, পরের ট্রেনে সে আসছে কিনা।"

ধরা গলায় নানী বললেন, "আশা করছি, আসবে সে। কিন্তু ভারী ভাবনা হচ্ছে। ভালো ঠেকছে না আমার, এক্কেবারে ভালো ঠেকছে না।"

"আমারও ভালো মনে হচ্ছে না," মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলো পনিও।

মোটরের ভেঁপু হাতে সেই ছেলেটা

ট্রামটা কাইজার অ্যাভিনিউ পেরিয়ে ট্রাউটেনাউ অ্যাভিনিউতে পড়ে প্রথমবার থামতেই বৌলার টুপি পরা লোকটা নেমে পড়লো। সাথে সাথে স্যুটকেস আর ফুলের তোড়া তুলে নিয়ে যে লোকটা তার ভাড়া দিয়েছিলেন তাঁকে আর একবার নিচু গলায় 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে এমিলও নেমে গেলো। ট্রামের সম্মুখ দিয়ে লাইনটা পার হয়ে রাস্তার অপর পাশে চললো চোর। ট্রাম চলে গেলে এমিল দেখলো উল্টোদিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। একটু ইতস্তত করে কয়েকটা সিঁড়ি পেরিয়ে সে উঠে গেলো একটা ক্যাফের বাইরের দিকের খোলা চত্বরে।

সত্যিকারের একজন গোয়েন্দা যেভাবে খুব সতর্ক হয়ে সন্দেহজনক লোকের পিছু নেয়, তেমনি সতর্ক হতে চাইলো এমিল। চট করে চারদিকে একবার তাকিয়ে এমিল দেখলো রাস্তার কোনায় খবরের কাগজের একটা স্টল। লুকোবার জন্য চমৎকার জায়গা বটে। তাড়াতাড়ি সেখানে চলে এলো এমিল। ভারী স্যুটকেসটা নামিয়ে টুপিটা খুললো এমিল। তারপর ভাবতে লাগলো এবার কি করা উচিত।

রেলিঙের পাশে একটা আসন বেছে নিয়েছে লোকটা। সেখানে বসে রাস্তার দিকে তাকাতে লাগলো সে। একটা সিগারেট টানছিলো, মুখটা বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে তার। চোরটা বেশ ফুর্তিতে আছে, আর যার কাছ থেকে চুরি হলো সে আছে মহা ঝামেলায়। এটা ভাবতে গিয়ে বেশ বিরক্ত হয়ে উঠলো এমিল। চোরের বদলে তাকেই খবরের কাগজের দোকানের পেছনে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে। এজন্য বেশ রাগ হলো তার। এমিল দেখলো, লোকটা কফির অর্ডার দিয়ে আর একটা সিগারেট ধরালো। এটা দেখে মনটা নিশ্চয়ই হালকা হয়ে উঠলো না এমিলের। কিন্তু লোকটা এখন উঠে চলে গেলে আরো খারাপ হবে। তাহলে এমিলকে আবার স্যুটকেসটা নিয়ে ছুটতে হবে তার পেছন পেছন। লোকটা যতক্ষণ এখানে আছে, ততক্ষণ এমিল নিজে যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। অপেক্ষা করতে করতে যদি দাড়িও গজিয়ে যায়—তবু পরোয়া করে না সে। কিন্তু তার আগেই অবশ্য কোনো পুলিশ তাকে দেখবে আর কাছে এসে জানবে কি করছে সে ওখানে।

পুলিশ বলবে, "ঘুর ঘুর করা হচ্ছে? সন্দেহের ব্যাপার বটে!" হয়তো আরও বলবে, "চুপচাপ আমার সাথে চলো হে ছোকরা। নইলে হাতকড়া লাগাতে হবে।"

এমনি দুশ্চিন্তার মধ্যে যখন ডুবে আছে, হঠাৎ তার পিছনে মোটর হর্নের বিকট শব্দ শুনে ভীষণ চমকে লাফিয়ে উঠলো সে। কিন্তু পেছন ফিরে শুধু দেখতে পেলো একটা ছেলেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে।

"ঠিক আছে, ঘাবড়ে যেও না ভাই," বললো ছেলেটা।

এমিল বললো, "আমার তো মনে হয়েছিলো যেন ঠিক ঘাড়ের ওপর একটা মোটর গাড়ি এসে পড়েছে।"

"বেকুব কোথাকার! সে তো আমিই। এখানে থাকো না তুমি নিশ্চয়ই। থাকলে চিনতে ঠিক আমাকে। প্যান্টের পকেটে সবসময় একটা মোটর-ভেঁপু রাখি আমি। সবাই আমার আর আমার মোটর-ভেঁপুর কথা জানে।"

এমিল বুঝিয়ে বললো, "আমি থাকি নয়স্টডটে। ইস্টিশান থেকে এইমাত্র আসছি আমি।"

ছেলেটা বললো, "ও, গ্রাম থেকে! তাই-তো ও-রকম বিদঘুটে পোশাক পরেছো তুমি।"

"কথাটা ফিরিয়ে নাও," এমিল রেগে বললো। "নইলে এক ঘুসিতেই কাৎ করে দেবো।"

হাসতে হাসতে মোটর ভেঁপুওয়ালা ছেলেটা বললো, "মাথাটা ঠিক রাখো। অতো গরম মাথায় বক্সিং লড়া যায় না—অবশ্য সত্যিই যদি লড়তে চাও, তা'হলে আমিও রাজি।"

এমিল বললো, "লড়বার বেশি ইচ্ছে নেই। ওটা পরে হবে। সময় নেই এখন আমার।" গ্রুণ্ডআইস তখনো ক্যাফেতে আছে কিনা দেখার জন্য চট করে একবার সেদিকে দেখে নিলো সে।

ছেলেটা বিদ্রূপ করে বললো, "দেখেতো মনে হচ্ছিলো প্রচুর সময় আছে তোমার। বেঢপ একটা স্যুটকেস আর বড়ো বাঁধাকপির মতো ফুলের তোড়া নিয়ে শুধু দাঁড়িয়ে আছো। ভাবছিলাম একলাই বুঝি লুকোচুরি খেলছিলে নিজের সাথে। তা, দেখে তো মনে হয় না তোমার খুব তাড়া আছে।"

"সত্যি কথা বলতে কি আমি একজন চোরের উপর চোখ রাখছি এখন," এমিল বললো।

মোটর-ভেঁপুর সেই ছেলেটা চেচিয়ে উঠলো, "কি বললে? চোর? কি চুরি করেছে সে ? কার কাছ থেকে ?"

এমিল বেশ গম্ভীর হয়ে ভারিক্কি-চালে বললো, "আমার কাছ থেকে। ট্রেনে আমি যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তখন সে সাত পাউন্ড নিয়ে নিয়েছে আমার পকেট থেকে। টাকাটা আমি বার্লিনে নানীর জন্য নিয়ে আসছিলাম। চুরি করার পর আমাদের কামরাটা ছেড়ে সে অনেক পেছনের কামরায় চলে যায়। কিন্তু জুলজিক্যাল গার্ডেনস্ ইস্টিশানে ওকে আমি নামতে দেখি। সেখান থেকে ওর পিছু নিয়েছি। একটা ট্রামে উঠে পড়েছিলো সে, আর এখন বসে আছে ঐ ক্যাফেতে। দেখো, ঐ যে লোকটা—যার মুখটা খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছে— যে লোকটার মাথায় একটা বৌলার টুপি।"

ছেলেটা বললো, "বাহ্, কী মজার কাণ্ড! ঠিক যেন সিনেমার মতো। এরপর কি করবে তুমি ?"

"জানি না," এমিল স্বীকার করলো। "তবে ও যেখানে যাবে সেখানেই পিছু পিছু যাবো।"

"ঐ যে ওখানে একটা পুলিশ আছে। তাকে গিয়ে বলো না কেন? তোমার হয়ে লোকটার উপর সে নিশ্চয়ই নজর রাখবে।"

এমিল সোজা বললো, "পুলিশকে বলার ইচ্ছে আমার নেই। নয়স্টড্‌ট-এর পুলিশ এখন হয়তো আমার খোঁজ করছে। সেখানে এক কাণ্ড করেছিলাম।"

"বুঝলাম।"

"নানী আমার জন্য ফ্রিয়েড্‌রিশ ইস্টিশানে নিশ্চয়ই এখনো অপেক্ষা করছেন।"

মোটর হর্নের মালিক মিনিট খানেক ধরে গভীরভাবে চিন্তা করলো ব্যাপারটা, তারপর বললো, "সত্যিকারের একজন চোরের পিছু নেয়া আর তাকে ধরা একটা দারুণ ব্যাপাার। উফ্! তুমি যদি অমত না করো তাহলে আমিও তোমাকে সাহায্য করতে পারি। খুশি হয়ে এমিল উত্তর দিলো, "খুব খুশি হবো তাহলে।"

"তাহলে সব ঠিক হয়ে গেল এখন। ভালো কথা, আমার নাম গুস্তভ।"

"আমার নাম এমিল।"

তারা দু'জন হ্যান্ডসেক করলো। দু'জনকে দু'জনের দারুণ ভালো লেগেছে।

গুস্তভ বললো, "কাজ শুরু করে দেয়া যাক এখনি। শুধু দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। চোরটা আমাদের বোকা বানিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। তোমার কাছে টাকা-কড়ি কিছু আছে?

"কানাকড়িও নেই।"

গুস্তভ আস্তে তার হর্ন বাজালো। এভাবে হর্ন বাজালে তার মাথাটা খুলে যায়। কিন্তু এবারে কোনো কাজ হলো না।

"তোমার কয়েকজন বন্ধুকে সাহায্য করতে বললে কেমন হয়?" এমিল প্রস্তাব দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে গুস্তভ চেঁচিয়ে বললো, "ঠিক বলেছো। হর্ন বাজাতে বাজাতে রাস্তা দিয়ে দৌড়ে গেলে কি হয়েছে দেখার জন্য দলের সবাই ছুটে আসবে।"

এমিল বললো, "তাই যাও তা'হলে। দেরি করো না যেন। লোকটা চলে যেতে পারে। তা'হলে আমাকেও তার পিছু পিছু যেতে হবে। তখন তুমি আমাদের হয়তো আর খুঁজেই পাবে না।"

"ঠিকই বলছো তুমি। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসবো," গুস্তভ বললো। "বিশ্বাস করো আমাকে। চোরটা এখন ডিম খাচ্ছে, মনে হয় শিগ্‌গীর সে উঠছে না। ঘাবড়ে যেও না এমিল। কী কাণ্ড! আমি এ রকম একটা কিছু খুঁজছিলাম। দারুণ জমবে এবার।" কথাগুলো বলেই সে ছুটে চলে গেলো।

এমিলের মনটা হাল্‌কা হয়ে উঠলো। নোটগুলো চুরি হওয়া দুঃখের কথা অবশ্য— তবে, কথা হচ্ছে, যে কোনো লোকেরই বরাতে এটা ঘটতে পারতো। সাহায্যকারী বন্ধুদের পেয়ে অবস্থাটা তার এখন অন্য রকম। চোরের উপর কড়া নজর রেখে চললো সে। লোকটা বেশ আনন্দের সাথে খাবার খেয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, খাবারের পয়সাটা মিসেস টিশবাইনের টাকা থেকেই যাবে— যে টাকা রোজগার করতে তাঁকে দারুণ খাটতে হয়েছিলো। গুস্তভ ফিরে আসার আগেই লোকটা উঠে যেতে পারে— এটাই এখন এমিলের একমাত্র ভয়।

তবে মিঃ গ্রুন্ডআইস, যেন এমিলকে বাধিত করবার জন্যই, ক্যাফের টেবিলে বসে রইলো। তার বিরুদ্ধে যেসব তোড়-জোড় চলছে তার বিন্দুমাত্র আভাস পেলেই হয়তো সে প্রাইভেট প্লেন ভাড়া করে পালাতো, অবশ্য সেটা যদি তার পক্ষে সম্ভব হতো।

দশ মিনিট পর এমিল আবার মোটর-ভেঁপুর শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। দেখলো, ডজন দু'য়েক ছেলে পথ দিয়ে আসছে তার দিকে, সামনে গুস্তভ।

খবরের কাগজের স্টলের কাছে আসতেই গুস্তভ চেঁচিয়ে বললো, "হল্ট!"

একগাল হেসে এমিলকে বললো সে তারপর, "কেমন?"

খুশি হয়ে গুস্তভের পাঁজরে খোঁচা মেরে এমিল বললো, "বাঃ! দারুণ!"

ছেলেদের দিকে ফিরে গুস্তভ বলে চললো, "এই হলো নয়স্টড্‌টের এমিল। আর ঐ যে রেলিঙের পাশে কালো বৌলার টুপি পরে বসে আছে—ঐ ছুঁচোটাই ওর নোটগুলো চুরি করেছে। নোটগুলো নিয়ে কেটে পড়তে পারলে ওর তো পোয়াবারো। আমাদের উপরই এখন নির্ভর করছে সব, বুঝলে?"

মোটা ফ্রেমের চশমা-পরা একটা ছেলে বললো, "ওকে আমরা ঠিকই ধরে ফেলবো, গুস্তভ।"

"এই হচ্ছে প্রফেসার," বললো গুস্তভ। তারপর একে একে সকলের সাথে এমিলকে পরিচয় করিয়ে দিলো।

প্রফেসার বললো, "এবার কাজ শুরু করা যাক। প্রথমেই দেখা যাক, পয়সা-কড়ি আমাদের কত আছে।"

প্রত্যেকটি ছেলে পকেট উল্‌টে তাদের কাছে যা আছে সব এমিলের টুপিটার মধ্যে ফেললো। খুব বাচ্চা একটা ছেলের কাছে এক শিলিং ছিলো। টুয়েস্‌ডে ওর নাম। উত্তেজনায় একবার এক পায়ে আবার অন্য পায়ে লাফাতে লাগলো। পয়সা-কড়ি গুনবার ভার পড়েছিলো ওর উপর।

সে জানালো, "সব মিলিয়ে আমাদের আছে পাঁচ শিলিং আট পেন্স। এটাই হচ্ছে আমাদের ফান্ড। আমরা একসাথে না-ও থাকতে পারি---তাই আমাদের তিন জনের মধ্যে এটা ভাগ করে রাখা দরকার।

প্রফেসার সায় দিয়ে বললো, "ঠিক বলেছো।" তাকে আর এমিলকে দেওয়া হলো দু'শিলিং করে। গুস্তভ নিলো বাকি এক শিলিং আট পেন্স।

এমিল বললো, "অনেক ধন্যবাদ। চোরটাকে ধরার সঙ্গে সঙ্গে এটা শোধ করতে পারবো আমি। এরপর কি করবো আমরা? এই স্যুটকেস আর ফুলের তোড়াটা কোথাও রাখতে পারলে ভালো হতো। দৌড়াতে গেলে এগুলো দারুণ অসুবিধে করে।"

গুস্তভ বললো, "ওগুলো আমাকে দাও। ক্যাফের কাউন্টারে রেখে আসি। তখন লোকটাকে ভালো করে দেখে আসতে পারবো।"

প্রফেসার বললো, "সাবধানে যেয়ো কিন্তু। জোচ্চোরটা যদি বুঝতে পারে আমরা ওর পিছু নিয়েছি, তা'হলে কাজটা আরো কঠিন হবে।"

"কি ভাবো তোমরা আমাকে, এঁ্যা?" গরগর করে উঠে গুস্তভ এমিলের জিনিসগুলো নিয়ে চলে গেলো।

ফিরে এসে বললো সে, "দেখার মত মুখ বটে ব্যাটার! তোমার স্যুটকেস-টুটকেস ঠিকই থাকবে, এমিল। যখন ইচ্ছে তখনই নিয়ে আসা যাবে।"

"আমাদের একটা যুদ্ধ-মন্ত্রণা সভা ডাকা দরকার," এমিল বললো। "তবে এতো লোকের সামনে এখানে নয়।"

প্রফেসার উত্তর দিলো, "নিকোলাস স্কোয়ারে যাওয়া যাক তা'হলে। কাছেই হবে ওটা। লোকটার ওপর নজর রাখার জন্য আমাদের দু'জন এখানে থাকবে। পথের মধ্যে পাঁচ-ছ'জন গুপ্তচর থাকবে। যে কোনো খবর সাথে সাথেই ওরা আমাদের জানাতে পারবে। লোকটা যদি বেরোয় অমনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ফিরবো আমরা।

গুস্তভ বললো, "আরে সে-সব আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি এখানে থেকে নজর রাখবো।" তারপর এমিলের দিকে তাকিয়ে বললো সে, "ভেবো না কিছু। আমরা লোকটাকে পালাতে দেবো না। তোমরা তাড়াতাড়ি যাও। সাতটাতো বেজেই গেছে।"

গুস্তভ ছেলের দলকে চটপট তৈরি করে ফেললো। সারা পথ জুড়ে গুপ্তচরেরা নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো। দলের আর সবাই ছুটে চললো নিকোলাস স্কোয়ারের দিকে এমিল আর প্রফেসারের নেতৃত্বে।

জড়ো হলো সব ডিটেকটিভ

নিকোলাস স্কোয়ারে একটা বাগান আছে। ছেলেরা এসে বসলো সেখানে। কেউ কেউ শাদা বেঞ্চি দু'টোয়, বাকি সবাই এক-টুকরো ঘাসের জমি ঘিরে-রাখা নিচু রেলিঙে। সকলের মুখই বেশ গম্ভীর।

ছেলেরা যাকে 'প্রফেসার' বলে ডাকতো, সে এমন একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো। চশমা খুলে নিয়ে কাচ দু'টো সে ঘসতে লাগলো। খুব গুরুতর কিছু বলার সময় তার বাবার হাবভাব যে রকম হয়ে থাকে, সেও হুবহু সে রকম করতে লাগলো। তার বাবা জজ।

সে বলতে শুরু করলো, "খুব সম্ভব এই কাজটা করতে গিয়ে আমাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে। তাই একজন কাউকে টেলিফোনের কাছে রাখতে হবে আমাদের। আচ্ছা, কার কার বাড়িতে টেলিফোন আছে ?"

বারোটা হাত উঠে গেলো।

"কার বাবা-মা সবচেয়ে ভালো?"

"মনে হয় আমার," বাচ্চা টুয়েস্‌ডে বললো।

"তোমাদের টেলিফোন নম্বর কত?"

"ব্যাভেরিয়া ০৫৭৯।"

"বেশ। এখানে কাগজ-কলম রইলো। ক্রুম্, কাগজটা কুড়ি টুকরো করে প্রত্যেকটায় টুয়েস্‌ডে'র ফোন নম্বর লিখে ফেলো। দেখো, সবাই যেন পড়তে পারে, বুঝেছ ? তারপর হাতে হাতে দিয়ে দাও। এটাই আমাদের রিপোর্ট দেবার জায়গা। সবসময় টুয়েস্‌ডে-কে সেখানে খবর পাঠাতে হবে—কি হচ্ছে, কে কোথায় রয়েছে, কে কি করছে—সব। তাহলে কেউ খবর জানতে চাইলে শুধু টুয়েস্‌ডে-কে ফোন করলেই হবে।"

"আমি কিন্তু বাড়িতে থাকবো না," ভয়-পাওয়া স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো বাচ্চা টুয়েস্‌ডে।

প্রফেসার জোর দিয়ে বললে, "হ্যাঁ, তোমাকে থাকতে হবে। আমাদের প্ল্যান ঠিক হয়ে গেলে সোজা বাড়িতে গিয়ে টেলিফোনে কান লাগিয়ে বসে থাকবে।"

"কিন্তু চোর ধরার সময় আমিও থাকতে চাই," টুয়েসডে আপত্তি করলো। "আমি ছোটো, অনেক কাজে লাগতে পারি আমি।"

"না, বাড়ি গিয়ে টেলিফোনের কাছে থাকবে তুমি," প্রফেসার বেশ জোরের সাথে বললো। "সেটা দরকারি কাজ আর খুব গুরুত্বপূর্ণও।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি যদি বলো," অনিচ্ছার সাথে যেন রাজি হলো টুয়েসডে।

ততক্ষণে কাগজের টুকরোগুলো ক্রুম বিলি করে ফেলেছে। প্রত্যেকে বেশ সাবধানে সেটা পকেটে রেখে দিলো। অতি উৎসাহী কেউ কেউ নম্বরটা মুখস্থ করে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে।

এমিল বললো, "আমাদের কয়েকজন রিজার্ভ থাকা দরকার। হঠাৎ যদি দরকার পড়ে।"

"ঠিক বলছো, একমত হলো প্রফেসার।" যারা পিছু নেবার কাজে থাকবে, তারা এই নিকোলাস স্কোয়ারে থাকবে। পালা করে বাড়ি গিয়ে বলে আসবে তোমরা, ফিরতে দেরি হতে পারে। কিংবা বন্ধুর বাড়িতে রাত কাটাবে, এমন কথাও বলে আসতে পারো। সকাল পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হলে সেটা বলাই ভালো। এমিল, গুস্তভ, ক্রুম, মিটলার ভাই দু'জন আর আমি—আমরা থাকবো ফ্রন্ট লাইনে। আমাদের বাড়িতে বরং টেলিফোন করে জানিয়ে দেয়া দরকার যে, ফিরতে আমাদের দেরি হবে। আর কি করতে হবে ? ও-হ্যাঁ-ট্রাউট, তুমি হবে বার্তাবাহক। আমরা ডেকে পাঠালে সাথে সাথে নিকোলাস স্কোয়ারে যাবার জন্য প্রস্তুত থেকো। আচ্ছা, এখন তাহলে আমাদের রইলো ডিটেকটিভ, রিজার্ভ, টেলিফোন আর বার্তাবাহক। মনে হচ্ছে, আপাতত এগুলোই হচ্ছে সব থেকে বেশি জরুরি।

"তোমরা সত্যিই সব বোকার হদ্দ," হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো ট্রাউট। তোমরা বলছো শুধু খাবার, টেলিফোন আর কিভাবে বাড়ির বাইরে রাত কাটাবে তার কথা। কিন্তু চোরকে কিভাবে ধরবে তার কথাতো কিছুই বলছো না। তোমরা হচ্ছো সব—সব—কথার ফানুস।" এর চেয়ে অপমানকর কথা আর সে ভেবে পেলো না।

পিটার্স প্রশ্ন করলো, "আঙ্গুলের ছাপ তুলে নেবার মতো যন্ত্রপাতি কিছু আছে তোমাদের কাছে ?" সিনেমায় সে এতো সব রোমাঞ্চকর কাহিনী দেখেছে যে তার মাথা প্রায় বিগড়ে যাবার যোগাড়। সে বলে চললো, "অবশ্য লোকটা রবারের দস্তানা পরেছিলো হয়তো। তাহলে তার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করা যাবে না।"

ট্রাউট বললো, "বোকার মতো বক্‌বক্ করো না। লোকটার উপর শুধু নজর রাখবো আমরা আর সুযোগ পেলেই নোটগুলো হাতিয়ে নেবো।"

"না—না—একেবারেই নয়," রাগে চেঁচিয়ে বললো প্রফেসার। "আমরা যদি ওভাবে নোটগুলো নিই, তাহলে আমরাই আবার চোর বনে যাবো।"

ট্রাউট বললো, "বাজে কথা বলো না। কেউ যদি আমার জিনিস চুরি করে আর আমি যদি সেটা আবার চুরি করে নিই, তাহলে আমি চোর হয়ে যাই না।"

"হয়ে যাও," প্রফেসার ঘোষণা করলো।

"এ-রকম গাঁজাখুরি কথা আর কখনো শুনিনি," গর্ গর্ করতে করতে বললো টাউট।

এমিল বললো, "আমার মনে হয় প্রফেসার ঠিকই বলেছে। কাউকে কিছু না বলে নেওয়া মানেই চুরি করা। জিনিসটা কার সম্পত্তি তাতে কিছু আসে যায় না।"

প্রফেসার বললো, "হ্যাঁ, একেবারে খাঁটি কথা। এখন দোহাই তোমাদের, খুব একটা চালাক হবার চেষ্টা করো না। যতটা পারি, আমরা গুছিয়ে নিয়েছি সব। ঠিক কবে লোকটাকে ধরতে পারবো সেটা এখনো আমরা জানি না। কাজ করতে করতে আমাদের প্ল্যানটা ঠিক করতে হবে। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। সেটা হলো—টাকাটা নিজে থেকে ওকে ফেরত দিতে হবে। নোটগুলো তার কাছ থেকে চুরি করার চেষ্টা মানেই বোকামি।"

"বুঝলাম না আমি," তর্কের সুরে বললো টুয়েস্‌ডে। "আমার নিজের জিনিস আমি নিজে কি করে চুরি করবো? যেটা আমার জিনিস, সেটা আমারই, অন্য লোকের কাছে থাকলেও সেটা আমার।"

প্রফেসার বললো, "এটা বুঝিয়ে বলা শক্ত। এমন কি বড়রাও অনেকে এটা বুঝতে পারে না। নৈতিক দৃষ্টিতে তুমি ঠিক, কিন্তু আইনের কাছে এটা অপরাধ। বিচার হলে তোমাকে এ কারণে চোর সাব্যস্ত করা হবে। এই হলো আইন।"

"যাক্‌কে বাপু, তোমাদের যা ইচ্ছে করো," কাঁধ ঝাঁকিয়ে ট্রাউট বললো।

"কি করে লোকের পিছু নিতে হয় জানো তোমরা?" প্রশ্ন করলো পিটার্স। "না জানলে নির্ঘাৎ সে বুঝে ফেলবে তোমাদের মতলব— সবটাই ভণ্ডুল হয়ে যাবে।"

"হ্যাঁ, কিছু বাছা গোয়েন্দা দরকার আমাদের," বললো বাচ্চা টুয়েস্‌ডে। তাই ভাবছিলাম—আমি কাজে লাগতে পারি। লোকের পিছু নিতে আমার জুড়ি নেই। কুকুরের ডাকও ডাকতে পারি আমি।" একগাল হেসে তারপর বললো সে, "তোমরা আমাকে পুলিশ-কুকুর হিসেবেও কাজে লাগাতে পারো।"

অধৈর্য হয়ে এমিল বললো, "আমার মনে হয় তাতে করে বার্লিনে আমরা লোকের দৃষ্টি আরো বেশি আকর্ষণ করবো।"

পিটার্স বলে চললো, "জানো, তোমাদের একটা রিভলবার থাকা দরকার।"

"হ্যাঁ, তাই তো, একটা বন্দুক আমাদের থাকা উচিত," দু'একজন সায় দিলো তাতে।

প্রফেসার কঠোরভাবে বললো, "না, উচিত নয়।"

"বাজি রেখে বলতে পারি চোরটার কাছে বন্দুক আছে," ট্রাউট বললো।

এমিল বললো, "কাজটা যে বিপজ্জনক তাতে সন্দেহ নেই। যার ভয় করছে সে বাড়ি ফিরে বিছানায় ঘুমোতে যেতে পারে।"

"আমাকে কাপুরুষ বলছো?" ঘুসি বাগিয়ে ট্রাউট জানতে চাইলো।

"অর্ডার, অর্ডার", চেঁচিয়ে উঠলো প্রফেসার। "ইচ্ছে করলে কাল লড়তে পারো তোমরা, এখন নয়। তোমরা একেবারে বাচ্চাদের মতো ব্যবহার করছো।"

"আমরা তো বাচ্চাই," বলে উঠলো টুয়েস্‌ডে আর তার কথায় হেসে উঠলো সবাই।

"নানীর কাছে কয়েক লাইন লিখে পাঠানো উচিত আমার," বেশ উৎকণ্ঠার সুরে জানালো এমিল। "আমি কোথায় এটা ভেবে তাঁরা খুব চিন্তায় থাকবেন। পুলিশের কাছেও যেতে পারেন তাঁরা। আমরা যখন কাজে নামবো, তখন আমার হয়ে কেউ একটা চিঠি নিয়ে যেতে পারবে? তাঁরা থাকেন ১৫ নম্বর শুমান স্ট্রীটে।"

ব্রেট নামের ছেলেটি বললো, "আমি যাবো। চট্‌পট লিখে দাও, দরোজা বন্ধ করার আগেই যাতে পৌঁছে দিতে পারি। কেউ ভাড়াটা দিলে মাটির নিচের ট্রেন দিয়ে যাবো।"

প্রফেসার তাকে চার পেন্স দিলো। যাতায়াতের জন্য এটা যথেষ্ট। এমিল কাগজ-পেন্সিল চেয়ে নিয়ে লিখলো ঃ

নানী,

আমার কি হয়েছে এটা নিয়ে নিশ্চয় খুব ভাবছো তোমরা! আমি বার্লিনে ঠিকভাবেই পৌঁছেছি। কিন্তু একটা খুব জরুরি কাজ করতে হচ্ছে বলে তোমাদের কাছে যেতে পারছি না। কি কাজ সেটা কিন্তু বলতে পারবো না এখন। তবে চিন্তা করো না। তোমাদের দেখতে আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে। এদিকে সবকিছু সেরে গেলেই আমি সরাসরি তোমাদের কাছে চলে আসবো। যে ছেলেটা এই চিঠি নিয়ে যাচ্ছে সে আমার বন্ধু। সে জানে আমি কোথায় আছি। তবে সেটা জানানো এখন ঠিক হবে না। আপাতত এটা গোপন রাখতে হবে। সবাইকে আমার ভালবাসা দিও।

ইতি
তোমার আদরের
"এমিল"

পুনশ্চ ঃ মা-মণি তোমাকে ভালবাসা দিয়েছেন। তোমার জন্য এক তোড়া ফুল এনেছি। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সেগুলো তোমার জন্য নিয়ে আসছি। কাগজটা ভাঁজ করে এবার সে উল্‌টো পিঠে ঠিকানা লিখলো।

ব্রেটকে বলে দিলো সে, "কোথায় আছি সেটা ওঁদের বলো না। টাকা হারিয়েছে তাও না। ওঁরা জানতে পেলে অসুবিধে হবে খুব।"

"অলরাইট," ব্রেট বললো। "দাও দেখি ওটা এখন। ফিরে এসে টুয়েসডেকে ফোন করে জেনে নেবো এখানে কি ঘটেছে। তারপর গিয়ে রিজার্ভে থাকবো।" এক দৌড়ে চলে গেলো সে।

এর মধ্যে পাঁচটা ছেলে খাবার নিয়ে ফিরে এসেছে। জেরোল্ড নিয়ে এসেছে প্রচুর লিভার সসেজ। সে বললো, তার মা দিয়েছেন ওটা। পাঁচ জনই বাড়িতে বলে এসেছে ফিরতে তাদের দেরি হতে পারে। এমিল স্যান্ডউইচে ভাগ বসালো। অন্য সময়ের জন্য সসেজটা রেখে দিলো সে।

তারপর আরো পাঁচজন বাইরে থাকার অনুমতি আনার জন্য বাড়ি গেলো। তাদের মধ্যে দু'জন ফিরলো না। সম্ভবত মা-বাবা ওদের আর বেরোতে দেন নি।

"আমাদের একটা সঙ্কেত-শব্দ থাকা দরকার যাতে টেলিফোন করলে টুয়েসডে বুঝতে পারে," প্রফেসারের হঠাৎ মনে পড়ে গেলো। "অজানা লোকদের নাক গলাবার ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না। আমাদের সঙ্কেত-শব্দ হবে 'এমিল'। এটা সহজে মনে থাকবে।"

বার্তাবাহক ট্রাউটকে সঙ্গে নিয়ে ছোট্ট টুয়েসডে বাড়ি চলে গেলো তারপর। ট্রাউট তখনো উশ্‌খুশ্‌ করছিলো। যাবার সময় বললো সে, "তোমাদের শুভ কামনা করি।" প্রফেসার চেঁচিয়ে বললো তাদের, "শোনো, বাবাকে ফোনে বলে দিয়ো খুব জরুরি কাজে ব্যস্ত আমি। তাহলে আমার ফিরতে দেরি হলে চিন্তা করবেন না তিনি।" শেষের কথাটা অবশ্য এমিলকে উদ্দেশ্য করে বলা।

এমিল মন্তব্য করলো, "বার্লিনের বাবা-মা'রা দেখছি বেশ সদয়।"

কানের পেছনটা চুলকোতে চুলকোতে ক্রুম বললো, "ভেবোনা, সব বাবা-মারাই এক রকম।"

"মোটামুটি তাঁরা অবুঝ নন," প্রফেসার জানিয়ে দিলো। "তাঁদের বেশির ভাগই বিশ্বাস করেন, মোটামুটি আমাদের উপর নির্ভর করা যায়। আমি বাবাকে কথা দিয়েছি কোনো কিছু খারাপ কিংবা বিপজ্জনক কাজ আমি করবো না। যতক্ষণ কথাট মনে রাখছি ততক্ষণ যা ইচ্ছে তা করতে পারি। বাবা খুবই ভালো।"

"নিশ্চয়ই খুব ভালো তিনি। কিন্তু আজকের কাজটা বিপজ্জনকও হতে পারে। যদি তাই হয়?" এমিল যোগ করলো।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রফেসার বললো, "এ ধরনের ব্যাপারে বাবা সবসময় বলেন, "আমি তোমার পাশে থাকলে কি করতে ভেবে দেখো।' জানি আজকেও তিনি অই কথাই বলতেন। ঠিক আছে, চলো এখন বেরিয়ে পড়া যাক।" তারপর সে দাঁড়িয়ে অন্য ছেলেদের উদ্দেশ্যে বললো ঃ

"শোনো ভাইরা সব, আমাদের এই ডিটেকটিভ দলকে নির্ভর করতে হবে নিজেদের উপর। যোগাযোগ ব্যবস্থা করা হয়েছে। টুয়েসডের নম্বর তোমাদের সবার জানা। আমার ভাগের পয়সাটা তোমাদের কাছে রেখে গেলাম। কারণ সেটা বাদ দিয়ে যথেষ্ট আছে আমাদের কাছে। বাকি আছে এক শিলিং আট পেন্স। জেরোল্ড, গুনে দেখবে একবার? আমাদের সবারই খাবার আছে সাথে। আর একটা কথা— কেউ যদি বাড়ি যেতে চায় তাহলে সে এখুনি যেতে পারে। কিন্তু মনে রেখো, এখানে ডিউটিতে অন্তত পাঁচজনকে থাকতে হবে। জেরোল্ড, এ বিষয়ে নজর রাখবে তুমি। তোমাদের শক্তিটা দেখিয়ে দাও। আর বিশ্বাস করো, আমরাও আমাদের যতটুকু সম্ভব করবো। আমাদের যদি সাহায্যের দরকার হয়, তাহলে তোমাদের খবর দেবার জন্য ট্রাউটকে পাঠাবে টুয়েসডে। আর কিছু জিজ্ঞেস করার আছে? নেই? সবকিছু পরিষ্কার তো? সঙ্কেত শব্দটা ভুলে যেওনা কিন্তু 'এমিল'।"

"সঙ্কেত-শব্দ এমিল" সবাই এক সাথে এমন জোরে চিৎকার করে বললো যে তাতে, চকের চারদিকে গম্‌ গম্‌ করে উঠলো। পথের লোকেরা অবাক হয়ে ভেবে পেলো না কি হচ্ছে ওখানে!

সবকিছুই এমন উত্তেজনাময় যে, নোটগুলো চুরি গেছে বলে এমিল বরং খুশিই হয়ে উঠলো।

ফাঁদে পড়লো শিকার

ট্রাউটেনাউ স্ট্রীটে যে তিনজন গুপ্তচর মোতায়েন করেছিলো গুস্তভ দৌড়তে দৌড়তে আর ইশারায় তরুণ গোয়েন্দাদের ডাকতে ডাকতে পাগলের মতো নিকোলাস স্কোয়ারে ছুটে এলো তারা।

"চলে এসো," চেঁচিয়ে উঠলো প্রফেসার। তারপর সে, এমিল, মিট্‌লার ভাই দু'জন আর ক্রুম ছুটলো কাইজার অ্যাভিনিউ-এর দিকে। এমন জোরে ছুটলো যেন একশ গজের দৌড়ে বিশ্ব-রেকর্ড ভাংগবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে তারা। খবরের কাগজের স্টলটার কাছে এসে তারা তাদের গতি কমালো আর গুস্তভের ইশারা দেখতে পেয়ে এগুতে লাগলো আরো সাবধানে।

হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করলো এমিল, "খুব দেরি ফেলেছি কি?" "পাগলের মতো কথা বলো না," ফিস্ ফিস্ করে বললো গুস্তভ। "কোনো কাজ করার ওয়াদা করলে সেটা ভালো করেই করি আমি।"

ক্যাফের সামনে ফুটপাথের উপর চোরকে তখন দেখতে পেলো তারা। চারিদিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন স্যুইজারল্যান্ডে রয়েছে সে আর প্রাকৃতিক দৃশ্যের তারিফ করছে সেখানকার। একটা সান্ধ্য দৈনিক কিনলো সে হকারের কাছ থেকে, তারপর চোখ বুলোতে লাগালো হেডলাইনগুলোর উপর।

"লোকটা এদিকে এলেই হবে মুশ্‌কিল" বলে উঠলো ক্রুম। খবরের কাগজের স্ট্যান্ডের পেছনে লুকিয়ে তার উপর নজর রাখছিলো তারা। উত্তেজনায় ভরপুর সবাই। চোর মশাই খবরের কাগজ পড়ে চললো। অন্যদিকে দেখার ফুরসুৎ নেই তার।

"মনে হচ্ছে খবরের কাগজের উপর চোখ বুলোবার ছল করে সে চোখ কুচকে দেখছে তার উপর কেউ নজর রাখছে কিনা," বড় মিটলার বলে উঠলো।

'যখন তুমি অপেক্ষা করছিলে তখন কি সে ঘন ঘন তোমার দিকে তাকিয়েছিলো?" গুস্তভকে জিজ্ঞাসা করলো প্রফেসার। "না, একবারও না," গুস্তভ উত্তর দিলো। "খানাপিনায় খুব ব্যস্ত ছিলো। দেখলে ভাবতে বেটা অনেকদিন খেতে পায় নি।"

"দেখো, দেখো," এমিল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো।

লোকটা খবরের কাগজটা ভাঁজ করছিলো। আশে-পাশের লোকজনের উপর তাড়াতাড়ি একবার চোখ বুলিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকলো সে। সামনে এসে থামলে উঠে পড়লো, তারপর সশব্দে দরোজা বন্ধ করলো। এরই মধ্যে ছেলেরাও একটা ট্যাক্সি ডেকে নিলো।

গুস্তভ ড্রাইভারকে বললো, "যে ট্যাক্সিটা প্রাগ প্লেসে এই মাত্র বাঁক নিলো, দয়া করে সেটার পেছন পেছন চলুন। কিন্তু দেখবেন, যে লোকটা বসে রয়েছে সে যেন টের না পায় যে পিছু নেওয়া হচ্ছে।"

দ্বিতীয় ট্যাক্সিটা কাইজার অ্যাভিনিউ পেরিয়ে প্রথমটার সাথে নিরাপদ দূরত্ব রেখে চলতে লাগলো।

"ব্যাপার কি?" প্রশ্ন করলো ড্রাইভার।

"লোকটা একটা মতলবে আছে। ওকে আমরা চোখের বাইরে যেতে দিতে চাই না," গুস্তভ বুঝিয়ে বললো। "তবে ওটা আমাদের নিজেদের ব্যাপার, মনে রাখবেন।"

"ঠিক আছে," ড্রাইভার বললো। "পয়সা-কড়ি কত আছে তোমাদের?"

"যথেষ্ট!" বেশ ভারিক্কি চালে উত্তর দিলো প্রফেসার।

"ঠিক আছে। এমনি ভাবছিলাম আর কি!" ড্রাইভার বললো।

এমিল বললো, "ওর ট্যাক্সির নম্বর হচ্ছে আই এ ৩৭৩৩।" "এটা দরকার," কাগজে লিখতে লিখতে বললো প্রফেসার। ক্রুম সামনে ঝুঁকে ড্রাইভারকে সাবধান করে দিলো যেন খুব কাছে না নিয়ে যায়।

"কিচ্ছু ভেবো না, নেবো না আমি," বিড় বিড় করে বললো লোকটা। মটজ্ স্ট্রীট দিয়ে কিছুদূর গিয়ে, ভিক্টোরিয়া লুইস্ স্কোয়ার পেরিয়ে আবার তারা মটজ্ স্ট্রীটে এসে পড়লো। ট্যাক্সিটা দেখার জন্য ফুটপাথে কিছু লোক দাঁড়িয়ে পড়লো আর অতগুলো ছেলেকে ভিড় করে ওটায় চড়তে দেখে হেসে উঠলো ওরা।

"মাথা নামাও," হঠাৎ আদেশ দিলো গুস্তভ। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে সবাই নেমে পড়লো মেঝেয়।

"কি হয়েছে?" প্রফেসার প্রশ্ন করলো।

"ট্রাফিক লাইট লাল হয়ে গেছে। সামনের ট্যাক্সিটা থামবে এবার, পেছন পেছন আমাদেরটাও।" গুস্তভ বললো। সত্যি সত্যিই ট্যাক্সি দু'টো একটার পেছনে আর একটা দাঁড়িয়ে সবুজ আলোর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। দ্বিতীয় ট্যাক্সিটা দেখে মনে হয় খালি, কেননা ছেলেরা সব লুকিয়ে পড়েছিলো নিচু হয়ে। ড্রাইভার একবার ঘাড় ফিরিয়ে দৃশ্যটা দেখে নিয়ে নিচু গলায় হেসে উঠলো। আবার ট্যাক্সিটা চলা শুরু করলে ছেলেরা আস্তে আস্তে সিটে উঠে বসলো।

মিটারের দিকে তাকিয়ে উদ্বেগের সুরে প্রফেসার বললো, "আশা করি বেশিদূর যাবে না লোকটা। দশ পেন্স উঠে গেছে এরই মধ্যে।"

অল্পক্ষণ পরেই নোলেনডর্ফ স্কোয়ারে হোটেল ক্রাইডের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো আগের ট্যাক্সিটা। ছেলেদের গাড়ির ড্রাইভারও ব্রেক কষে নিরাপদ দূরত্বে থামালো গাড়িটা যাতে ওরা দেখতে পায় এর পর কি হয়।

বৌলার টুপি পরা লোকটা ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিলো, তারপর হোটেলের মধ্যে ঢুকে গেলো। ত্বরিত কণ্ঠে প্রফেসার চেঁচিয়ে উঠলো, "গুস্তভ, পিছু নাও। বেরুবার দু'টো দরোজা থাকলে ওকে হারাবো আমরা।" চোখের পলকে গুস্তভ হাওয়া হয়ে গেলো।

বাকি ছেলেরা হুড়োহুড়ি করে নেমে এলো। এমিল ভাড়া চুকিয়ে দিলো। মিটারে এক শিলিং উঠেছিলো। একটা সিনেমা হলের পাশের তোরণের নিচ দিয়ে প্রফেসার ওদের নিয়ে চললো। একটা গলির ভেতর দিয়ে উঠোনে এসে পড়লো তারা। উঠোনটা সিনেমা হল আর তার পাশাপাশি নোলেনডর্ফ থিয়েটারের ঠিক পেছনে। তারপর ক্রুমকে সে পাঠালো গুস্তভের খোঁজ নেবার জন্যে।

"লোকটা এই হোটেলে থাকলে আমাদের বেশ সুবিধে হয়," এমিল বললো। "ঘাঁটি হিসেবে এটা একেবারে পয়লা নম্বরের।"

"হ্যাঁ। সব রকম আধুনিক সুযোগ-সুবিধা আছে এখানে," এমিলের সাথে একমত হলো প্রফেসার। "উল্‌টো দিকে মাটির তলার স্টেশন। গা'ঢাকা দেবার জন্যে ও জায়গাটা বেশ ভালো। কাছেই রেস্তোরাঁ। সেখানে টেলিফোনের খুপরিও আছে। এর চেয়ে ভালো আর হতেই পারে না।"

"আশা করি গুস্তভ একটু সাবধানে থাকবে," বললো এমিল।

বড় মিটলার বললো, "ওর উপর আস্থা রাখতে পারো। বোকার মতো দেখায় ওকে, কিন্তু আসলে ও বোকা নয়।"

"ভাবছি, চটপট ফিরবে সে," উঠোনে কার যেন ফেলে রাখা চেয়ারটায় বসতে বসতে বললো প্রফেসার। যুদ্ধের আগে প্রধান সেনাপতির মতো দেখাতে লাগলো ওকে। খুশিতে ডগ্‌মগ্ হয়ে হাত ঘষতে ঘষতে এবার ফিরে এলো গুস্তভ। সে বললো, "লোকটাকে এবার বাগে পেয়েছি। হোটেলে একটা রুম নিয়েছে সে। লিফ্‌ট দিয়ে ওকে উপরে উঠতে দেখেছি আমি। বাইরে যাবার আর কোনো পথ নেই। পুরো বাড়িটা তন্ন-তন্ন করে দেখে এসেছি আমি। ছাতে উঠে যদি না পালায়, তাহলে বাছাধনকে আমরা ফাঁদে ফেলেছি।"

"ক্রুম পাহারা দিচ্ছে সেখানে?" প্রফেসার প্রশ্ন করলো। "নিশ্চয়ই," গুস্তভ জানালো।

টুয়েসডে-কে টেলিফোন করার জন্য প্রফেসার বড় মিটলারকে পয়সা দিয়ে পাঠালো।

কানেকশন পেয়ে বললো সে, "হ্যাল্লো কে? টুয়েসডে?"

"বলছি," অন্য প্রান্ত থেকে উত্তর এলো।

"সঙ্কেতশব্দ 'এমিল'। মিটলার বলছি। নোলেনডর্ফ স্কোয়ারে হোটেল ক্রাইডে 'বৌলার টুপি' একটা ঘর নিয়েছে। সেখানকার সিনেমা হলের পেছনের উঠোনে আমরা ঘাঁটি করেছি।"

বাচ্চা টুয়েসডে খবরগুলো লিখে নিয়ে ফের পড়ে শোনালো। "আরো সৈন্য দরকার?" জানতে চাইলো সে।

"খুব বেশি ঝামেলা গেছে কি?"

"বেশি কিছু না। একটা ট্যাক্সি নিয়েছিলো সে। আমাদেরও আর একটা নিয়ে ওর পিছু নিতে হয়। এখন সে হোটেলে তার নিজের ঘরে। মনে হচ্ছে, বিছানার নিচে উঁকি দিয়ে দেখছে কেউ আছে কিনা। তারপর, আমার মনে হয়, সে নিজে নিজে তাস খেলবে।" টুয়েসডে জিজ্ঞেস করলো, "রুম নম্বরটা কত?"

"এখনো জানি না—তবে শিগ্‌গির বের করছি।"

"ইস্— আমি যদি থাকতে পারতাম তোমাদের সাথে! আগামীবার ইস্কুলে কোনো কিছু নিয়ে রচনা লিখতে দিলে আমি এটাই লিখবো।"

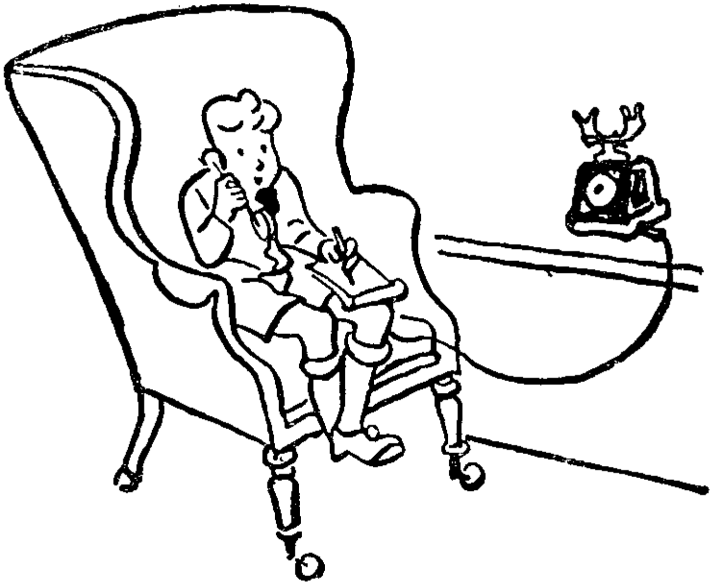

"আর কেউ ফোন করেছে?"

"কেউ না। ভীষণ একঘেয়ে লাগছে আমার।"

"আচ্ছা, এখন চলি তাহলে।"

"গুড্ লাক্!—ও! কি কাণ্ড! ভুলে গিয়েছিলাম—সঙ্কেত-শব্দ 'এমিল'।"

"সঙ্কেত শব্দ-এমিল," মিটলার বললো। তারপর রিপোর্ট দেবার জন্য আবার সেই উঠোনটার দিকে চললো।"

আটটা বাজে। প্রফেসার প্রহরীদের দেখে আসার জন্যে গেলো। "দুত্তোর! আজ রাতে লোকটাকে বোধ হয় ধরা যাবে না," গুস্তভ অধৈর্য হয়ে বলে বসলো।

"লোকটা সোজা ঘুমোতে গেলে মন্দ হবে না ব্যাপারটা," এমিল বুঝিয়ে দিলো, "আবার যদি সে বেরিয়ে যায়, ট্যাক্সি নিয়ে যদি যায় রেস্তোরাঁয়, নাইট-ক্লাবে অথবা থিয়েটারে তাহলে মুশকিল হবে। ওর পেছনে ধাওয়া করার মতো টাকা-কড়ি আমাদের নেই।"

প্রফেসার ফিরে এসে মিটলার ভাই দু'জনকে বাইরে স্কোয়ারের দিকে পাঠালো। ওরা দু'জন সংযোগকারী হিসেবে কাজ করবে এখন।

সে বললো, "লোকটাকে কি করে আটকানো যেতে পারে এ নিয়ে আমাদের চিন্তা করা দরকার। তোমরা সবাই ভালো করে একবার ভাবো দেখি!"

গভীর চিন্তায় ডুবে স্থির বসে রইলো তারা। সহসা বাই-সাইকেলের ঘণ্টির শব্দে ছেদ পড়লো ওদের চিন্তায়। ঝকঝকে নতুন একটা বাই-সাইকেল তীরবেগে এসে পড়লো উঠোনে। পনি ওটা চালাচ্ছিলো আর ব্রেট আছে তার পেছনে চাকার ওপর দাঁড়িয়ে। অন্য সবাইকে দেখে তারা দু'জনে একসাথে চিৎকার করে উঠলো, "থ্রি চীয়ার্স!"

পনিকে চিনতে পেরে এমিল লাফিয়ে উঠে ছুটে গেলো ওদের সাহায্য করার জন্য। তারপর আনন্দে হ্যান্ডশেক করলো তারা দু'জনে। "এ হচ্ছে আমার খালাতো বোন পনি হুট্‌চেন কিংবা হেইমবোল্ড," সে বললো। প্রফেসার ভদ্রভাবে চেয়ার ছেড়ে দিলো, পনি সেখানে বসেই সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফেরালো এমিলের দিকে।

"তুমি একটা অদ্ভুত লোক!" পনি চেঁচিয়ে বললো। "বার্লিনে এসে ট্রেন থেকে নামতে না নামতেই একেবারে রোমাঞ্চকর একটা ব্যাপারে গিয়ে পড়েছো। কী কাণ্ড! নয়স্টড্‌টের দ্বিতীয় ট্রেনটা খুঁজবার জন্য আমরা বেরোতে যাবো, ঠিক তখুনি তোমার চিঠিটা নিয়ে তোমার বন্ধু ব্রেট হাজির। ভালো কথা, বেশ ভালো ছেলে সে। ওকে আমার ভালো লেগেছে।"

ব্রেটের মুখ লাল হয়ে উঠলো। বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো সে। "মা-বাবা-নানী সবাই এখন বাড়িতে বসে তোমার কি হলো ভেবে-ভেবে সারা হচ্ছেন। ব্রেট অন্তত ওঁদের সামনে কিছুই বলবে না আমাকে। তাই বললাম একতলা পর্যন্ত ওকে পৌঁছে দিয়ে আসি। তারপর চুপচাপ বেরিয়ে পড়েছি বাড়ি থেকে, এসে গেলাম ওর সাথে এখানে। যাক্, আমার এক্ষুনি ফেরা দরকার। নতুবা পুলিশে খবর দেবেন ওঁরা। একদিনে দু'জনকে হারিয়ে তা সহ্য করার মতো শক্ত নার্ভ ওদের নেই।"

ব্রেট পেনি দু'টো বের করে দিলো। সগর্বে বললো সে, "পেনির সাইকেল ফেরার ভাড়াটা বাঁচিয়ে দিয়েছে।" প্রফেসার পয়সাটা নিয়ে পকেটে রেখে দিলো।

"ওরা রেগে গেছেন নাকি?" এমিল জিজ্ঞেস করলো পনিকে। "একটুও নয়," পনি উত্তর দিলো। "নানী একটু ক্ষেপেছেন। উনি বলছিলেন, 'মনে হচ্ছে, প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে গেছে সে'। শেষ পর্যন্ত বাবা-মাও ভাবতে শুরু করেছেন সেটা। আশা করি, কাল ধরতে পারবে লোকটাকে। তা তোমাদের শার্লক হোমস্‌টি কে?"

"প্রফেসার। এইতো এখানে সে।" বললো এমিল।

পনি হেসে বললো, "তোমার সাথে দেখা হওয়ায় খুশি হলাম খুব। আসল একজন গোয়েন্দা দেখার ভীষণ ইচ্ছে ছিলো আমার।"

প্রফেসারও হেসে উঠলো। লজ্জা পেয়েছিলো সে। তারপর আমতা আমতা করে কি যেন বললো একবর্ণও বুঝা গেল না তার।

"যাবার আগে আমার হাতখরচের পয়সাটা তোমাদের দিয়ে যাই," পনি বললো। "এই যে---আট পেনি আছে এখানে। এটা দিয়ে একটা কি দু'টো সিগার কিনে নিতে পারো তোমরা।"

এমিল পয়সাটা নিলো। কিন্তু পনি একমাত্র চেয়ারটায় এমনভাবে বসে রইলো যেন সেরা সুন্দরী সে আর তাকে ঘিরে আছে নির্বাচকমণ্ডলী।

অবশেষে বললো সে, "এবার যেতেই হবে আমাকে। কিন্তু ঠিক সকালে চলে আসবো আমি। কোথায় ঘুমাবে তোমরা? আমিও যদি থাকতে পারতাম তোমাদের সাথে। কফি বানিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু আমার মতো ভালো মেয়েদের ঠিক সময়ে বিছানায় যেতে হয়। আচ্ছা, ধন্যবাদ সবাইকে। গুডনাইট, এমিল!"

খালাতো ভাইয়ের কাঁধে আদর করে একবার হাত রাখলো সে। তারপর লাফিয়ে তার সাইকেলে উঠে পাগলের মতো ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে চলে গেলো। সে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ ছেলেরা বসে রইলো নিশ্চুপ। তারপর প্রফেসার বিড় বিড় করে বললো, "ভালো, ভালো, ভালো।" তার বাবাও ঠিক অমনভাবে বলেন। অন্যরা ভাবলো, ঠিকই বলেছে প্রফেসার।

হোটেলের ভিতরে গুপ্তচর

সময় কাটছে যেন খুব ধীরে ধীরে।

গার্ড তিনজনকে দেখার জন্য এমিল বাইরে এলো। আশা ছিলো তার, ওদের একজনের বদলে সে থাকতে পারবে। কিন্তু ক্রুম আর মিটলাররা দুই ভাই জানালো তারা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। তখন খুব সন্তর্পণে হোটেলের প্রবেশ-পথে ঢুকলো সে কিছু একটা দেখার আশায়। তারপর ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ফিরে এলো।

সে বললো, "আমার মনে হয়, সারা রাত ধরে হোটেলের মধ্যে একজন গুপ্তচর রাখা দরকার। ক্রুম রাস্তার কোনায় দাঁড়িয়ে নজর রাখছে ঠিকই, কিন্তু একবার সে ঘাড় ফেরালেই গ্রুন্ডআইস সুড়ুৎ করে বেরিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে। আমরা কিছুই জানতো পাবো না।"

"তোমার কথাটা ঠিক," গুস্তভ উত্তর দিলো। "কিন্তু তুমি সোজা গিয়ে পোর্টারকে বলতে পারো না যে, সারারাত সিঁড়িতে বসে থাকতে চাও তুমি। আর তুমি ঢুকলেও বা--- বৌলার টুপি একবার দেখেই যদি চিনে ফেলে তোমাকে ? তোমার সব পরিশ্রমই বৃথা তখন। না, যাই হোকনা কেন, ভিতরে যেতে পারবে না তুমি।"

এমিল বললো, "আমি সেটা বলতে চাইনি।"

"কি বলতে চেয়েছো তুমি?" প্রফেসার প্রশ্ন করলো।

"হোটেলে নিশ্চয় ফাই-ফরমাশ খাটার জন্য কোনো ছোকরা আছে---লিফ্ট-টিফ্ট যে চালায়। ভাবছিলাম আমাদের কেউ একজন তার সাথে ভাব করতে পারে আর বুঝিয়ে বলতে পারে সব। জায়গাটাকে সে নিশ্চয়ই নিজের হাতের উল্টো পিঠের মতোই চেনে। সারা রাত ধরে রুমটার উপর কি করে নজর রাখা যায় সেটা জানা যায় তাহলে।"

"ভালো কথা," প্রফেসার বললো। "খুব ভালো কথা।" স্কুল-মাস্টারের মতো কথা বলা তার স্বভাব। ছেলেরা সেজন্যই তার নাম দিয়েছে 'প্রফেসার'।

"ভালো কথা বলেছো এমিল," গুস্তভ বললো। " যে কেউ ভাববে বার্লিনেরই ছেলে তুমি। এ রকম চমৎকার আর কোনো প্ল্যান দিতে পারলে তোমাকে সারা শহরের স্বাধীনতা দিয়ে দিতে হবে আমাদের।"

"শুধু যে বার্লিনের লোকদেরই মগজ আছে তা নয়," এমিল উত্তরে বললো। নয়স্টড্টের প্রতি উপেক্ষার ভাবটা তার পছন্দ হলো না। "ভালো কথা, আমাদের বক্সিংটা কিন্তু এখনো লড়া হয় নি।" "কি ? কি বললে তুমি ?" প্রফেসার প্রশ্ন করলো।

এমিল বললো, "আমার সবচেয়ে ভাল স্যুটটাকে যা-তা বলেছে গুস্তভ।"

"বেশ, কাল বরং তোমাদের লড়াই হোক," প্রফেসার সিদ্ধান্ত করলো, "হয় কাল, নতুবা কখনো নয়।"

"হ্যাঁ, তোমার স্যুট ঠিকই আছে," তাচ্ছিল্যের সুরে বললো গুস্তভ। "এখন ওটা আমার সয়ে গেছে। তুমি যখন বলবে তখনই তোমার সাথে লড়তে রাজি আমি। কিন্তু মনে রেখো, শহরের যে পাড়ায় থাকি, সেখানকার চ্যাম্পিয়ন আমি। অতএব সাবধান!"

" আমিও আমার স্কুলের চ্যাম্পিয়ন," এমিল বললো।

"উঃ, চুপ করোতো দেখি দু'জনে," প্রফেসার বাধা দিলো।

"তোমাদের ঘুষোঘুষির কথা শুনতে শুনতে তিতি-বিরক্ত হয়ে গেলাম। কোথায় আমি ভাবছি কি করে হোটেলে ঢুকবো। এখন দেখছি তোমাদের দু'জনকে একলা রেখে যেতে পারি না। অমনি তোমরা ঘুষোঘুষি শুরু করে দেবে হয়তো।"

"আমি যাই তাহলে," গুস্তভ বললো।

প্রফেসার বললো, "বেশ, তাই যাও। গিয়ে লিফ্‌টবয়ের সাথে আলাপ করো। কিন্তু সাবধান! দেখো গিয়ে কিছু করতে পারো কিনা। অন্তত লোকটা কোন ঘরে আছে সেটা জানা চাই। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে রিপোর্ট করতে হবে তোমাকে।"

গুস্তভ চলে গেলো। এমিল আর প্রফেসার বাইরে এসে তোরণের পাশে রাস্তায় দাঁড়ালো। ওরা তাদের স্কুল আর মাস্টারদের গল্প করতে লাগলো। পাশ দিয়ে যেসব মোটর-গাড়ি যাচ্ছিলো প্রফেসার চিনিয়ে দিতে লাগলো ওগুলো---কোন কারখানায় তৈরি আর কি ভাবে চেনা যায়। তারপর একটা করে স্যান্ডউইচ খেলো তারা। অন্ধকার হয়ে আসছিলো। নানা রকম বিজ্ঞাপনের আলোগুলো জ্বলতে আর নিভতে শুরু করলো। মাথার উপরের লাইন দিয়ে সশব্দে ছুটে চলে যাচ্ছে ট্রেন। মাটির তলাকার ট্রেনের গুম্‌গুম্ শব্দ শোনা যেতে লাগলো। পথের উপর দিয়ে ছুটে চলা ট্রাম, বাস, মোটর-গাড়ি আর মোটর বাইকগুলোর গর্জন শুনতে শুনতে এমিলের মনে হলো যেন কেউ পাগলের মতো অদ্ভুত অর্কেস্ট্রা বাজিয়ে চলেছে। কাছের একটি ক্যাফে থেকে ভেসে আসছিলো নাচের বাজনার সুর। সিনেমার শেষ শো দেখার জন্য জড়ো হচ্ছে লোকেরা চকের চারপাশে।

এমিলের কাছে সব কিছুই কেমন যেন অদ্ভুত আর দারুণ রোমাঞ্চকর ঠেকলো। সে প্রায় ভুলেই গেলো কি করে ওখানে এসেছে সে। ভুলে গেছে চুরি যাওয়া সেই সাত পাউন্ডের কথাও।

"ইস্টিশানের পাশে অই বড় গাছটা দেখে বেশ মজা লাগছে আমার," এমিল জানালো। " যেন ভুল করে ওটা ওখানে রয়ে গেছে। সন্দেহ নেই বার্লিন অপূর্ব। তবে সব-সময় বার্লিনে থাকতে আমার ভালো লাগবে বলে মনে হয় না। নয়স্টড্‌ট ছোট্ট শহর। সেখানে দু'টো বাজার, একটা স্টেশান স্কোয়ার, নদীর তীরে খেলার মাঠ আর আম্‌জেল পার্ক---এসবই আছে। কিন্তু আমার জন্য যথেষ্ট। এখানে এতো হট্টগোল যে মনে হয় সব-সময়ের জন্য একটা মেলা জমেছে। এতো স্ট্রীট আর স্কোয়ার যে---যে কোনো সময় পথ হারিয়ে ফেলতে পারি। তোমাদের সাথে দেখা না হলে আজ রাতে কী যে করতাম আমি। এখানে একা সারা রাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকার কথা ভাবলেও ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে।"

"অভ্যেস হয়ে যেতো তোমার," প্রফেসার বললো। "দু'টি বাজার আর একটি খেলার মাঠের শহর নয়স্টড্‌ট-এর মতো ছোটো জায়গায় আমিও হয়তো টিকতে পারবো না।"

"তোমারও সয়ে যেতো ওটা," এমিল উত্তর দিলো।

তারপর প্রফেসার জানতে চইলো, "তোমার মা খুব কড়া নাকি ?" "আমার মা ? মোটেই না! আমার যা ইচ্ছে তাই উনি করতে দেন। কিন্তু বেশির ভাগ সময় আমি তা করি না। জানি না, কথাটা বুঝতে পারছো কিনা।

"বুঝলাম না," প্রফেসার বললো।

"কথাটা হলো এই," বুঝিয়ে বললো এমিল। "তোমাদের অবস্থা ভালো?"

"আমি ঠিক জানি না"। বাড়িতে টাকা-পয়সা নিয়ে কেউ তেমন বলা-বলি করে না।

"তাহলে মনে হয় তোমাদের বেশ পয়সা-কড়ি আছে," বিজ্ঞের মতো বললো এমিল।

খানিকক্ষণ ভেবে প্রফেসার বললো, "মনে হয় তোমার কথাটাই সত্যি।"

"মা আর আমি টাকা-কড়ি নিয়ে বেশ আলোচনা করি। কারণ আমাদের টাকা-কড়ি খুব কম। তাঁকে খেটে রোজগার করতে হয়। আর সেজন্য খাটেনও তিনি খুব। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের তেমন বেশি কিছু থাকে না। তবু যখনই ইস্কুলের ছেলেদের সাথে বেড়াতে যাওয়া বা এ ধরনের অন্য কোনো বাড়তি খরচের কথা আসে---তিনি আমাকে অন্য ছেলেদের সমান খরচ দেন সব সময়---এমনকি কখনো কখনো বেশিও।

"কি করে যোগাড় করেন তিনি?" প্রফেসার প্রশ্ন করলো। "জানি না, কিন্তু পারেন তিনি। অবশ্য বরাবরই আমি কিছু না কিছু ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি।"

"তিনি কি চান সেটা?"

"না। কখনো না। কিন্তু কিছুটা ফিরিয়ে আনতে পারলে ভালো লাগে আমার।"

প্রফেসার বললো, "আচ্ছা! এই তাহলে তোমাদের বাড়ির ব্যাপার-স্যাপার।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললো এমিল, "হ্যাঁ! এই রকমেরই। মাঝে মাঝে সন্ধ্যার দিকে আমি প্রট্‌জ্‌শের সাথে বেড়াতে বেরোই। প্রট্‌জ্‌শরা আমাদের উপরতলায় থাকে। মাঝে মাঝে অন্য ছেলেদের সাথেও যাই। মা বলেন, নটার আগে বাড়ি ফেরার দরকার নেই আমার। কিন্তু প্রায়ই আমি আগে ফিরে আসি, ধরো সাতটার দিকে। এটা করি যাতে তাঁকে একা সন্ধ্যের খাবার খেতে না হয়। তিনি বলেন, বন্ধুদের সাথে আমার বাইরে কাটানো উচিত। আমি মাঝে মাঝে যাই অবশ্য। কিন্তু যখন আমার মনে পড়ে মা একা রয়েছেন তখনই আমার আর বাইরে থাকতে ইচ্ছে করে না। তিনি যাই বলুন না, আমাকে ফিরতে দেখলে খুশি হন তিনি।

"আমাদের বাড়িতে অবশ্য সেরকম না," প্রফেসার বললো। যদি কখনো হঠাৎ সকাল-সকাল বাড়ি ফিরি, তাহলে দেখি কেউ নেই বাড়িতে। হয় ডিনারে, নয় থিয়েটারে কিংবা অন্য কোথাও চলে গেছে সবাই। আমরা সবাই সবাইকে ভালোবাসি খুব। কিন্তু সকলেই যে যার নিজের মতো চলে।"

এমিল বললো, "একসাথে থাকার জন্য তেমন কিছু বাড়তি খরচ নেই। কিন্তু ভেবে বসোনা আমি মা'র আদুরে খোকা বা তেমন একটা কিছু। কেউ ও কথা বললে তার নাক ভোঁতা করে দেবো ঘুষি মেরে। বুঝলে তো?"

"হ্যাঁ, বুঝলাম," প্রফেসার বললো।

তোরণের নিচে চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো ওরা। রাত যেন নেমে আসছে। তারাগুলো পরিষ্কার ঝকমক করছে। চাঁদটা, মনে হচ্ছে, তার একটিমাত্র চোখ দিয়ে মাথার উপরকার রেলপথটার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রফেসার গলা ঝেড়ে নিলো একবার। তারপর এমিলের দিকে না চেয়েই বললো, "মনে হচ্ছে তুমি আর তোমার মা দু'জনে দু'জনকে খুব ভালোবাসো।"

এমিল শুধু বললো, "হ্যাঁ, বাসি।"

সবুজ পোশাকের দু'জন লিফ্‌ট-বয়

রিজার্ভ বাহিনীর একটা অংশ এসে হাজির হলো সেই উঠোনটায় রাত দশটার দিকে। পুরো একটা রেজিমেন্টকে খাওয়ানো যেতে পরে এতো স্যান্ডউইচ নিয়ে এসেছিলো তারা সাথে। পরবর্তী নির্দেশের খোঁজ করলো তারা।

প্রফেসার রেগে গিয়ে বললো তাদের ডেকে না পাঠানো পর্যন্ত আসার কোনো অধিকার নেই।

"আমি তোমাদের নিকোলাস স্কোয়ারে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম," মনে করিয়ে দিয়ে বললো সে, "অন্ততপক্ষে টেলিফোন হেডকোয়ার্টার থেকে ট্রাউট খবর নিয়ে না আসা পর্যন্ত।"

পিটার্স বললো, "বক্‌বক্ করোনা অতো। তোমরা কতটা এগুলে জানার জন্যে মরে যাচ্ছিলাম আমরা।"

"তাছাড়া ট্রাউট না আসায় আমরা ভয় করছিলাম কিছু একটা বিপদ ঘটেছে তোমাদের," কৈফিয়তের সুরে জেরোল্‌ড বললো।

এমিল প্রশ্ন করলো, "নিকোলাস স্কোয়ারে ক'জন আছে এখন?"

"তিন কি চারজন হবে," প্রথমে ফ্রেডারিক উত্তর দিলো।

"জনা দুই," জেরোল্‌ড বললো তারপর।

"এদের আবার জিজ্ঞেস করলে বলবে একজনও নেই সেখানে।" রেগে চেঁচিয়ে বললো প্রফেসার।

"নিজেকে কি ভাবো তুমি? চেঁচাচ্ছো কেন ষাঁড়ের মতো?" পিটার্সও বললো চেঁচিয়ে।

"আমি প্রস্তাব করছি এই ডিটেকটিভ দল থেকে পিটার্সকে বাদ দেয়া হোক এবং এই কেসে অংশগ্রহণ করার অনুমতি তাকে আর না দেয়া হোক।" পা ঠুকে প্রফসার বললো।

"আমার জন্যে তোমাদের ঝগড়া হলে আমি দুঃখ পাবো," এমিল বললো। "এ বিষয়ের উপর ভোট নেয়া হোক। পার্লামেন্টে ওরা যেমন করে। আমি প্রস্তাব করছি পিটার্সকে সাবধান করে দিয়ে এবারের মতো শেষ করা যাক। অবশ্যই নিজের খেয়াল-খুশি মতো কাউকে চলতে দিতে পারি না আমরা।"

"চুপ করো বোকারা সব," পিটার্স বললো। "চললাম আমি।" তার পর দুমদাম পা ঠুকে সে কি যেন বিড় বিড় করতে করতে চলে গেলো।

"এখানে আসার চিন্তাটা ওরই," জেরোল্‌ড বললো। "নাহলে আমরা কখনো আসতাম না। ঘাঁটি আগলাবার জন্য মেয়ার অবশ্য আছে ওখানে।"

"বাদ দাও ওসব।" শান্তভাবে বললো প্রফেসার। "এ নিয়ে আর কিছুই বলবো না আমরা।"

ফ্রেডারিক দি ফার্স্ট জিজ্ঞেস করলো, "এবার কি করবো আমরা ?"

এমিল বললো, "আমার মনে হয় গুস্তভ রিপোর্ট না আনা পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষা করাই ভালো।"

"ঠিক বলেছো," প্রফেসার বললো। "দেখো, দেখো, লিফ্‌ট্‌-বয় আসছে না?"

"হ্যাঁ, তাই তো," বললো এমিল।

সবুজ ইউনিফরম-পরা একটি ছেলে, মাথায় তার টুপি, এসে দাঁড়ালো তোরণের নিচে। তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লো। "ইউনিফরম্‌টা দারুণ," ঈর্ষার সুরে জেরোল্‌ড বিড় বিড় করে বললো।

"আমাদের গুস্তভ মানে গোয়েন্দার কাছ থেকে কোনো খবর এনেছো নাকি?" প্রফেসর জিজ্ঞেস করলো।

ছেলেটা মাথা হেলালো একটু, তারপর আরো কাছে এলো। "ভালো, খবরটা কি?" এমিল অধীরভাবে জানতে চাইলো।

হঠাৎ মোটরের ভেঁপুর শব্দ শোনা গেলো। আর সবুজ পোশাক-পরা ছেলেটা লাফিয়ে উঠে হাসিতে ফেটে পড়লো। "এমিল, এক নম্বরের বোকা তুমি," চেঁচিয়ে উঠলো ছেলেটা। ছেলেটা আসলে গুস্তভই, কোনো লিফ্‌ট-বয় নয়।

"তুমি?" বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো এমিল। তারপর ওরা সবাই এমন জোরে হেসে উঠলো যে উপরের কোঠার কোনো একটা জানালা খুলে কেউ একজন ওদের চুপ করতে বললো।

"বেশ করেছো, গুস্তভ," প্রফেসার বললো। "চুপ করো এবার সবাই। গুস্তভের রিপোর্ট শোনা যাক এখন।"

"সত্যি, দারুণ ব্যাপার ওটা," গুস্তভ বললো। "চুপিসারে হোটেলে ঢুকে দেখি লিফ্‌টের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। আমাকে দেখে এগিয়ে এলো সে আমি কি চাই জানতে। তখন পুরো ঘটনাটা সবিস্তারে বললাম ওকে—এমিলের টাকা চুরি যাবার কথা, আমাদের কথা—বললাম কেমন করে চোরটা হোটেলে এসে উঠলো। আরো বললাম আমরা পিছু নিয়েছি ওর যাতে আগামীকাল টাকাটা উদ্ধার করতে পারি। শুনে বেশ উৎসাহ দেখালো সে। বললো, একটা বাড়তি ইউনিফর্ম আছে ওর কাছে---ওটা পরে দ্বিতীয় লিফ্‌ট্‌-বয় সাজতে পারি আমি।"

"হল-পোর্টারের কি হবে', আমি জিজ্ঞেস করলাম। সে কিছু মনে করবে না ?"

"সে বললো, না, তিনি আমার বাবা।"

"জানি না বুড়ো বাবাকে সে কি বলেছে। তবে ইউনিফরমটা আমি ঠিকই পেয়েছি। সে আরো বলেছে চাকররা যেখানে থাকে সেখানকার একটা খালি ঘরে থাকতে পারি আমি—চাইকি তোমাদের একজন কাউকে নিয়ে যেতে পারি আমার সাথে। কেমন হলো বলোতো?"

প্রফেসার বললো, "চোরটা কোন ঘরে আছে জানতে পেরেছো?"

'কিছু লোক আছে যারা কিছুতেই খুশি হয় না', গুস্তভ চেঁচিয়ে বললো। "এতক্ষণ সেখানে কি করছিলাম মনে হয় তোমার ? ব্যাপারটা অতো পানির মতো সোজা নয়। তাছাড়া, অর্ধেকটাও শোনোনি তোমরা। ছেলেটা বললো, চোর রয়েছে চারতলার ৬১ নম্বর ঘরে। তার কথা শুনে চারতলায় উঠে চুপি চুপি দেখে নিলাম জায়গাটা। কেউ আমাকে দেখে নি—এ ব্যাপারে নিশ্চিত আমি। তারপর সিঁড়ির পাশের থামগুলোর আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। প্রায় আধঘণ্টা পর ৬১ নম্বর রুমের দরোজা খুলে বেরিয়ে এলো আমাদের চোরটা। দেখেই ঠিক চিনতে পারলাম। আজ বিকেলে ক্যাফেতে ওকে বেশ ভালো করে দেখে নিয়েছিলাম তো! ছোটো কালো গোঁফ, পাতলা, খাড়া হয়ে বেরিয়ে আছে উঁচু দু'টো কান আর বিচ্ছিরি মুখটা এমন যেন সাক্ষাৎ একটা শয়তান"

"বাথরুমে গেলো সে। সেখান থেকে বেরিয়ে এলে টুপিতে হাত রেখে বললাম তাকে," 'আপনার আর কিছ দরকার আছে স্যার?' 'না, কিছুরই দরকার নেই,' সে উত্তরে বললো। তারপর আবার আমাকে ডেকে বললো, "শোনো একমিনিট দাঁড়াও। হ্যাঁ—পোর্টারকে বলে দেবে কাল সকাল ঠিক আটটায় যেন আমাকে ডেকে দেয়। রুম নম্বর ৬১। ভুলোনা যেন।"

"ঠিক আছে স্যার," আমি বললাম, "ভুলবো না আমি। উত্তেজনায় কাঁপছিলাম। 'কাল ঠিক আটটার সময় আপনার টেলিফোন বাজবে।' হোটেলে ওরা এভাবেই ডেকে দেয়। জানো তো ? তারপর সে মাথা নাড়লো একবার। একটুও সন্দেহ করে নি সে। তখন নিজের রুমে চলে গেলো সে।"

"চমৎকার," ভীষণ রকম খুশি হয়ে প্রফেসার বললো। অন্য সকলেও তেমনি খুশি হলো। "আটটা থেকে আমরা সবাই গার্ড অব্ অনার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো ওর জন্যে। আর সে এলেই পিছু নেবো আমরা, তারপর ঠিকই ধরে ফেলবো ওকে।"

"এখন প্রায় বন্দীই হয়ে গেছে সে," জেরোল্ড হেসে মন্তব্য করলো। "না। ব্যাপারটা অত সহজ নয়।"গুস্তভ বললো, " হ্যাঁ! আমাকে এবার যেতে হবে। ১২ নম্বর রুমের একটা চিঠি পোস্ট করতে হবে। ছ' পেনি পেয়েছি সেজন্যে। বেশ ভালো পয়সা আসে এ কাজে। লিফ্ট্-বয় বলে, এক এক দিন দশ শিলিং পর্যন্ত রোজগার করে সে। আমাদের চোরটাকে যাতে ঠিক সময় ডেকে দেয়া হয় সেজন্যে কাল সকাল সাতটায় উঠবো আমি। তারপর এখানে এসে জানিয়ে দেবো তোমাদের।"

আন্তরিক সুরে এমিল বললো, "তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই, গুস্তভ। এবার সবকিছু ঠিক ঠিক চলবে। সবাই আমরা ঘুমোতে যেতে পারি। কাল চোরটাকে ধরবো আমরা। প্রফেসার, এর মধ্যে আর কিছু তো করবার নেই, কি বলো?"

"না। সবাই বাড়ি গিয়ে ঘুমোও। কাল কিন্তু সকাল আটটায় এখানে হাজির হতে হবে। কেউ কিছু পয়সা-কড়ি আনতে পারলে সুবিধে হয়। এখন বাচ্চা টুইসডেকে ফোন করে দেবো আমি। কাল সকালে যে কেউ ফোন করবে বাড়তি রিজার্ভ হিসেবে সে আসতে পারে আমাদের দলে। লোকটাকে ফাঁদে ফেলতে হবে এবার। আর তখন অনেক কিছুই ঘটতে পারে।

"হোটেলে তোমার সঙ্গেই আমার ঘুমুনো ভালো, তাইনা গুস্তভ?" এমিল বললো।

"ঠিক। আমার তো মনে হয় ভালোই লাগবে তোমার। জায়গাটা মোটামুটি খারাপ নয়।"

"টুইসডেকে টেলিফোন করেই আমি বাড়ি চলে যাবো," প্রফেসার বললো। "মেয়ারকেও বাড়ি পাঠিয়ে দেবো। নাহলে সে আবার অর্ডারের অপেক্ষায় সারারাত স্কোয়ারেই বসে থাকবে। এখন, সবকিছু ঠিক হলোতো?"

"হ্যাঁ, সর্দার।" একটু হেসে গুস্তভ উত্তর দিলো।

"কাল ঠিক সকাল আটটায় এখানে হাজির হবে সবাই," জেরোল্ড্ চেঁচিয়ে বললো।

"পয়সা-কড়ির কথাটা ভুলে যেওনা কিন্তু," সবাইকে কথাটা মনে করিয়ে দিলো ফ্রেডারিক দি ফার্স্ট।

তারপর তারা সবাই ব্যবসাদারদের মতো শুভ রাত্রি জানিয়ে হ্যান্ডশেক করে যে যার পথে চলে গেলো। গুস্তভ আর এমিল গেলো হোটেলের ভিতরে। নোলেনডর্ফ স্কোয়ার পেরিয়ে রেস্তোরাঁয় টেলিফোনের বাক্সের দিকে এগুলো প্রফেসার।

একঘণ্টা পর যে যার বাড়িতে নিজের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লো। শুধু হোটেল ক্রাইডের পাঁচতলার ছোট্ট একটা ঘরে রয়ে গেলো ওরা দু'জন—এমিল ও গুস্তভ।

বাচ্চা টুইসডে ক্লান্ত হলেও নিজের জায়গা ছাড়ে নি। টেলিফোনের পাশে বাবার আরাম কেদারায় ঘুমিয়ে পড়েছিলো সে। ট্রাউট বাড়ি চলে গিয়েছিলো। কিন্তু টুইসডে জায়গা ছেড়ে নড়বে না কিছুতেই—বসে থাকলো সে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শত শত টেলিফোন শুনতে লাগলো সে স্বপ্নে। মাঝ রাতে তার বাবা-মা থিয়েটার দেখে বাড়ি ফিরে ওকে সেখানে ঘুমোতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। মা তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। নড়লো না সে একটুও। শুধু ঘুমের মধ্যে বিড় বিড় করে বলতে লাগলো, "সঙ্কেত-শব্দ 'এমিল'।"

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
QA

ভিড় শুধু ভিড়

হোটেল ক্রাইডের ৬১ নম্বর ঘরের জানালা খুললে নোলেনডর্ফ স্কোয়ার দেখা যায়। পরদিন সকালে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে মিঃ গ্রুন্ডআইস নিচের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হয়ে গেলো। একপাল ছেলের ভিড় জমেছে চকের কাছে। ছেলেদের বেশ বড় একটা দল ঘাসের উপর ফুটবল খেলছে। আরো অনেক ছেলে ছোট ছোট জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্লাইস্ট স্ট্রীটের কোনায়—এমনকি আরো এগিয়ে মাটির নিচের রেলস্টেশনে ঢুকবার পথেও। 'মনে হচ্ছে এখন ছুটির দিন'—বিরক্ত হয়ে মনে মনে ভাবলো সে টাই বাঁধতে বাঁধতে।

এর মধ্যে সিনেমার পেছনের সেই ছোট্ট উঠোনে প্রফেসার তখন একটা সভা ডেকেছে। সবার দিকে ফিরে ফিরে বকবক করে যাচ্ছিলো সে।

সে বলে চললো, "কোথায় এই লোকটাকে ধরার জন্যে আমরা উপায় খুঁজে মরছি—আর তোমরা সব পাগলের দল, তোমাদের একটুও বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই, তোমরা কিনা বার্লিনের সব বাচ্চাদের এনে জড়ো করেছো এখানে। মাথা ঘামিয়ে আর লাভ কি? বুঝতে পারছো না আমাদের দিকে নজর নিয়ে আসা এখন একেবারে ঠিক নয়! আমরা তো আর সিনেমা বানাচ্ছি না! দর্শকেরও আমাদের দরকার নেই। লোকটা যদি ফস্‌কে যায় তাহলে দোষটা কিন্তু তোমাদেরই। একদম মুখ বুজে থাকতে পারো না তোমরা।"

অন্য ছেলেরা ঘিরে দাঁড়িয়েছিলো ওকে। বেশ মনোযোগের সাথে ওর বক্তৃতা শুনছিলো। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে এতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই ওদের।

জেরোল্‌ড্‌ বললো, "দুঃখিত, প্রফেসার। কিন্তু ভেবো না, বেটাকে আমরা ঠিকই ধরে ফেলবো।"

প্রফেসার বললো, "ঠিক আছে। কেটে পড়ো সব এখান থেকে। বোকার দল সব। আর ছেলেদের বলো গা ঢাকা দিতে। হোটেলের সামনে থেকে যেন চলে যায় সবাই। বুঝলে তো ? যাও—চটপট কেটে পড়ো এখন।" কয়েক মিনিটের মধ্যে উঠোনে ডিটেকটিভরা ছাড়া আর কেউ রইলো না।

"হল-পোর্টারের কাছ থেকে দশ শিলিং ধার করেছি আমি। এখন চোরটা পালাতে চাইলে আমরাও ট্যাক্সি নিয়ে ধাওয়া করতে পারবো ওর পেছন পেছন।"

"ওই সব বাচ্চাদের বাড়ি যেতে বললে না কেন ?" ক্রুম প্রশ্ন করলো।

প্রফেসার গজ্‌ গজ্‌ করে বললো, "ওরা যাবে ভেবেছো? বোমা মেরে পুরো চকটা উড়িয়ে দিলেও ওরা নড়বে না এখান থেকে।"

এমিল বললো, "এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে আমরা আমাদের প্ল্যান বদলাতে পারি। যে রকম অবস্থা দেখছি, গ্রুন্ডআইসের আর পিছু নেওয়া যাবে না। এখন তাকে সোজাসুজি এখানেই ধরতে হবে। সমস্ত বাড়তি শক্তির সাহায্য নিয়ে ঘেরাও করে ফেলতে হবে তাকে। কি ঘটছে সেটা নিশ্চয়ই সে বুঝতে পারবে।"

প্রফেসার বললো, "আমিও সেটা ভেবে দেখেছি। আমাদের কৌশল বদলানো দরকার, এ বিষয়ে আমি একমত। তাকে এমনভাবে কোণঠাসা করতে হবে, যাতে সে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।"

"ঠিক বলেছো," চেঁচিয়ে উঠলো জেরোল্ড্।

"যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই একশ'টা বাচ্চা তার পেছন পেছন চিৎকার করে ছুটছে—এটা সে কখনো চাইবে না। আশেপাশের সবার নজরে পড়ে যাবে সে। পুলিশের তো বটেই। না, এটা সে কখনো চাইবে না। তার বদলে নোটগুলো ফিরিয়ে দিতেই বেশি পছন্দ করবে সে," এমিল বললো।

বিজ্ঞ সমঝদারের মতো সবাই মাথা নাড়লো এমিলের কথায়। সেই মুহূর্তে বাই-সাইকেল ঘন্টির শব্দ শোনা গেলো গলির মধ্যে। তার পরেই প্যাডেল করতে করতে পনি এসে পড়লো সেখানে, মুখে তার একগাল হাসি।

"সুপ্রভাত সবাইকে," বলতে বলতে লাফিয়ে নামলো পনি তার সাইকেল থেকে। তারপর হ্যান্ডেল থেকে বাক্সটা খুলতে খুলতে বললো, "তোমাদের জন্য কিছু ব্রেকফাস্ট নিয়ে এলাম—কফি আর রোল-রুটি। একটা ঝকমকে কাপও। কী জ্বালা, হ্যান্ডেলটা যে খসে গেছে!"

ছেলেরা সবাই আগেই ব্রেক্রফাস্ট খেয়েছিলো। এমিল খেয়েছিলো হোটেলে। কিন্তু কেউ পনির মনে কষ্ট দিতে চাইলো না। হাতলভাঙ্গা কাপে কফি খেলো তারা আর রোল-রুটিগুলো এমন গোগ্রাসে গিলতে লাগলো যেন একমাস তারা কেউ খাবারের মুখ দেখে নি।

ক্রুম বললো, "বাঃ! দারুণ তো খেতে।"

"রোলগুলো বেশ মুচমুচে." খাবার ভরা মুখটা নাড়তে নাড়তে অস্পষ্টভাবে বললো প্রফেসার।

পনি বললো, "বাড়িতে মহিলা থাকলে সবকিছুর চেহারা বদলে যায়।"

"বরং বলা যাক উঠোনে," জেরোলড্ শুধরে দিলো। সবকিছুই একেবারে ঠিক ঠিক করে বলা চাই তার।

"শ্যুমান স্ট্রীটের খবর-টবর কি?" এমিল জিজ্ঞেস করলো।

"ধন্যবাদ, সবাই ভালো। নানী তোমার জন্য বিশেষ ভালোবাসা পাঠিয়েছেন। কিন্তু বলে দিয়েছেন তাড়াতাড়ি বাড়ি না ফিরলে যদ্দিন এখানে থাকবে তদ্দিন রোজ মাছ খাওয়াবেন তোমাকে। এটাই তোমার শাস্তি।"

"না, ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না," মুখটা তেতো করে বললো এমিল।

"মাছের দোষটা কি?" ছোটো মিটলার প্রশ্ন করলো। সবাই বড় বড় চোখে তার দিকে তাকালো, কারণ বাচ্চা মিটলার সচরাচর মুখ খোলে না। মুখটা লাল হয়ে উঠলো তার। বড় ভাইয়ের পেছনে গিয়ে লুকালো সে।

"এমিল মাছ খেতে পারে না একেবারে। খেলেই গা গুলিয়ে আসে তার," পনি বুঝিয়ে দিলো।

তারা সবাই বক্‌বক্‌ করে চললো। সবার মুখে বেশ উজ্জ্বল হাসি। মোটামুটি আনন্দে আছে তারা। আর ছেলেদের সবার মনোযোগ পনির দিকে। প্রফেসার তার বাইসাইকেল ধরে রইলো। থার্মোস আর কাপটা ধুয়ে দিলো ক্রুম। কাগজের যে ব্যাগে রোল-রুটি ছিলো বড়ো মিটলার সেটা ভাঁজ করে দিলো। এমিল বাস্কেটটা আবার বেঁধে দিলো হ্যান্ডেলের সঙ্গে। জেরোল্‌ড সাইকেলের টায়ার দু'টো টিপে টিপে দেখলো শক্ত আছে কিনা। আর পনি গান গেয়ে, বক্‌বক্‌ করে সমস্ত উঠোনময় নেচে নেচে বেড়াতে লাগলো। তারপর হঠাৎ থেমে এক পায়ের উপর ব্যালেন্স করে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললো ঃ

"চকের ওখানে ওই বাচ্চাগুলো কি করছে বলোনা! মনে হচ্ছে ওটা যেন ছুটির ক্যাম্প।"

উত্তর দিলো প্রফেসার, "ওরা শুনেছে আমরা একটা চোরকে ধাওয়া করেছি। তাই মজা দেখবার জন্য জুটেছে। আর সম্ভব হলে ওরাও যোগ দিতে চায়।"

সেই মুহূর্তে দারুণ জোরে হর্ণ বাজাতে বাজাতে গুস্তভ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলো উঠোনে।

চেঁচিয়ে বললো সে, "চলে এসো। সে বেরিয়ে পড়েছে।" আর সবাই অমনি সবকিছু ফেলে পড়ি কি মরি ছুটলো। প্রফেসার ওদের ডাক দিলো পেছন থেকে।

চিৎকার করে বললো সে, "থামো থামো। ভুলে যেওনা আমাদের প্ল্যান আছে একটা। আমরা ওকে ঘেরাও করবো। কয়েকজন ওর সামনে চলে যাও। আর ঠিক পেছনে থাকো কয়েকজন। বাকি সবাই দু'পাশ থেকে ছেঁকে ধরো ওকে। বুঝলে? দরকার মতো আবার আদেশ দেওয়া হবে। এখন, এগিয়ে চলো সবাই।"

তোরণের ভিতর দিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো ওরা চকে। উঠোন খালি। পনি একা। ভারী একা লাগলো তার। তারপর সেও লাফিয়ে উঠে সাইকেলে চড়ে ওদের পেছন পেছন চললো। চললো আর তার নানীর মতো বিড় বিড় করে বলতে লাগলো, "ভালো ঠেকছে না, এক্কেবারে ভালো ঠেকছে না আমার।"

বৌলার টুপি পরা লোকটা হোটেল থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে এলো। তারপর ডানদিকে ঘুরলো। প্রফেসার, এমিল আর গুস্তভ এদিকে-সেদিকে বাচ্চাদের নির্দেশ দিয়ে পাঠালো। সংবাদ বাহকরা দৌড়ে বাচ্চাদের দিকে গেলো আর এলো। এবং অল্পক্ষণ পরেই মিঃ গ্রুন্ডআইস দেখতে পেলো সে নিজে ঘেরাও হয়ে গেছে সম্পূর্ণ।

দারুণ অবাক হয়ে চারিদিকে তাকালো সে। চারপাশে তার গিজগিজ করছে ছেলের দল। সবাই তারা হাসছে, গল্প করছে নিজেদের মধ্যে, এ ওকে ঠেলা মারছে—কিন্তু সবাই তারা ঠিক তার পাশাপাশি এগুচ্ছে।

তারপর—হুশ করে একটা বল উড়ে গেলো তার মাথার উপর দিয়ে। সেটা তার ভালো লাগলো না। সে চেষ্টা করলো আরো তাড়াতাড়ি যেতে। ছেলেরাও অমনি জোরে ছুটলো। আর তেমনি ঘেরাও হয়ে রইলো সে। তারপর ছেলেদের ফাঁকি দিয়ে চট্‌ করে পাশের গলিতে ঢুকে পড়তে চাইলো সে। কিন্তু ছেলেদের ভিড় ঠেলে কিছুতেই এগুতে পারলো না। যেদিকে সে ফেরে সেদিকেই স্রোতের মতো ভিড় করে জড়ো হয়ে থাকে বাচ্চারা।

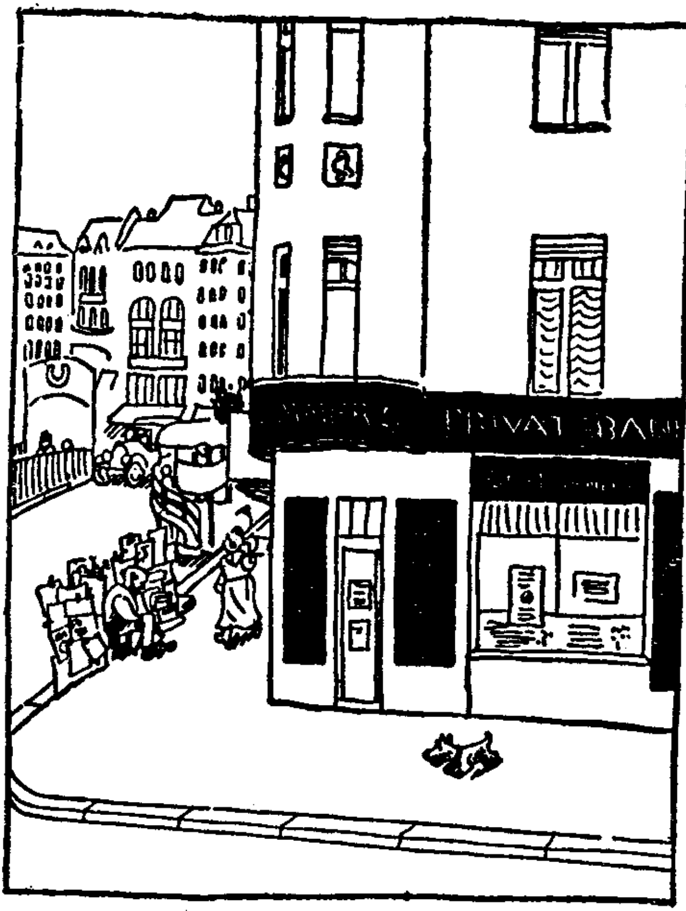

গুস্তভ বললো, "ওর মুখখানা একবার দেখো। মনে হচ্ছে যেন প্রাণপণে হাঁচি চাপবার চেষ্টা করছে।"

এমিল বললো, "আমার আগে আগে চলো। সে আমাকে এক্ষুনি চিনে ফেলুক এটা আমি চাই না। অবশ্য সে সময়টা আসতে আর খুব বেশি দেরি নেই।"

গুস্তভ বক্সিং চ্যাম্পিয়নের মতো বুক ফুলিয়ে হেসে-দুলে হাঁটতে লাগলো। জোরে প্যাডেল চালিয়ে দারুণ ফুর্তির সাথে সাইকেলের ঘন্টি বাজাতে বাজাতে পানি চললো ওদের সাথে।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে বৌলার টুপি পরা লোকটা বেশ ঘাবড়ে উঠেছে। তার কেমন যেন সন্দেহ হতে লাগলো যে, বাচ্চাদের এই দলটা তার বিপদ ঘটিয়ে ছাড়বে। আর ওরা

ঘিরেই রয়েছে তাকে। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে এগিয়ে যেতে চাইলো—কিন্তু কোনো লাভ হলো না তাতে। চলতে চলতে একবার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো সে, যে পথে আসছিলো সেই পথে ফিরে যাবার চেষ্টা করলো আবার। ছেলের দলও অমনি সাথে সাথে ঘুরে গেলো—আগের মতোই বেশ জবরদস্ত ঘেরাও হয়ে রইলো সে।

তখন ক্রুম তার সামনে গিয়ে ল্যাং মারলো তাকে।

"করছো কি তুমি ইডিয়ট কোথাকার?" গ্রুন্ডআইস চিৎকার করে বললো। "সরে যাও আমার পথ থেকে—না'হলে পুলিশ ডাকবো।"

"দয়া করে ডাকুন না," ক্রুম বেশ বিনয়ের সাথে বললো। "আমরা তো তাই আশা করছিলাম।"

পুলিশ ডাকবার সামান্য ইচ্ছাও অবশ্য মিঃ গ্রুন্ডআইসের ছিলো না। কিন্তু ব্যাপারটা ঠাট্টা-মশকরার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিলো তখন। সত্যি সত্যিই ভয় পেতে লাগলো সে। ভেবে কূল পেলো না কি করে এই বিচ্ছু ছোকরাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। তার উপর আবার—লোকেরা জানালা খুলে তার দিকে একদৃষ্টে তাকাতে শুরু করেছে আর ব্যাপারখানা কি দেখবার জন্যে দোকানের কর্মচারীরা বেরিয়ে আসছে ফুটপাতের উপর। এমন অবস্থায় কোনো পুলিশ এসে পড়লেই বারোটা বেজেছিলো আর কি! সামনে একটা ব্যাংকের ছোটো ব্রাঞ্চ অফিস দেখে মাথায় একটা বুদ্ধি এলো তার। ছেলেদের ভিড়ের চক্রটা ভেদ করে সে দৌড়ে ঢুকে পড়লো বাড়িটার মধ্যে। প্রফেসার তার পেছন পেছন ঢুকতে গিয়ে দরোজায় থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরে বললো ঃ

গুস্তভ আর আমি ওর পেছনে যাচ্ছি। এমিল, তুমি গুস্তভের হর্ন না শোনা পর্যন্ত বাইরে দাঁড়াও। হর্ন শুনলেই বুঝবে আমরা তৈরি। ভেতরে চলে এসো তখন। আর দশজন ছেলে আনবে তোমার সাথে। ওদের ভালো করে বেছে নিও। এবার কাজটা সত্যিই কঠিন।"

তারপর গুস্তভ আর সে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লো। এমিল বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলো। ভালো করে নিশ্বাসও নিতে পারছিলোনা সে। এই মুহূর্তটার জন্যই অপেক্ষা করছিলো এমিল। ছেলেদের সে বেছে নিলো—ক্রুম, জেরোল্ড্, দুই মিটলার এবং আরো কয়েকজন। বাকি সবাইকে ছড়িয়ে থাকতে বললো। তারা অবশ্য এক কি দু'পা পিছু হটলো। কারণ এরপর কি ঘটছে সেটা না দেখে কি করে থাকতে পারে তারা?

একটা ছেলেকে তার সাইকেল ধরতে দিয়ে পনি এমিলকে বললো ঃ

"আমি এখনো আছি এখানে। গুড্ লাক্! ব্যাপারটা বেশ জমে উঠেছে এবার, তাই না? ঈশ্, উত্তেজনায় আমি আর দাঁড়াতে পারছিনে।"

"আমারও তাই," এমিল বললো।

আলপিনের ফুটোর কেরামতি

ব্যাংকের মধ্যে ঢুকে গুস্তভ আর প্রফেসার দেখলো বৌলার টুপি পরা লোকটা কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে। দেখে মনে হলো লোকটা যেন তড়ি-ঘড়ি কাজ সারতে চায়। কিন্তু ক্যাশিয়ার তখন টেলিফোনে কথা বলছিলেন।

প্রফেসার নিঃশব্দে চোরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। বনবেড়ালের মতো তাকাতে লাগলো তার দিকে। পিছনে গুস্তভ। ট্রাউজারের পকেটে তার হাত হর্নটার উপর। অবশেষে টেলিফোন সেরে ক্যাশিয়ার কাউন্টারে এসে প্রফেসারকে জিজ্ঞেস করলেন কি তার দরকার।

বিনীতভাবে প্রফেসার বললো, "ইনি আমার আগে এসেছেন।"

ক্যাশিয়ার মিঃ গ্রুণ্ডআইসকে বললেন, "আপনার জন্য কি করতে পারি, বলুন!"

চোর উত্তরে বললো, "আমার কিছু খুচরো দরকার। এই পাঁচ পাউন্ডের নোটটার বদলে এক পাউন্ডের নোট দিন----আর এই দু'পাউন্ডের খুচরো দিন।" পকেট থেকে প্রথমে পাঁচ পাউন্ডের একটা ও পরে এক পাউণ্ডের দু'টো নোট বের করে সে কাউন্টারে দিলো।

সেগুলো নিয়ে ক্যাশিয়ার তাঁর ড্রয়ার খুললেন।

"এক সেকেণ্ড রাখুন।" চেঁচিয়ে বললো প্রফেসার। "এগুলো চুরি-করা নোট।"

"কি বলছো?" ক্যাশিয়ার তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে চিৎকার করে বললেন। ডেস্কের সামনে কেরানীরা বসে লম্বা যোগ করছিলো। কাজ থামিয়ে এমনভাবে তাকালো তারা যেন সাপের ছোবল খেয়েছে।

প্রফেসার বললো, "নোটগুলো এই লোকটার নয়। সে আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে এগুলো চুরি করেছে। আর শুধুমাত্র ঝুঁকি থেকে বাঁচবার জন্যেই সে খুচরো চাইছে। এগুলো আর নিজের কাছে রাখতে চায় না সে।"

"বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে।" গ্রুন্ডআইস চেঁচিয়ে বললো। তারপর ক্যাশিয়ারের দিকে ফিরে বললো, "মাপ্ করবেন, এ ধরনের কাজের একটাই মাত্র উত্তর।" বলেই প্রফেসারের গালে সে সজোরে চড় মারলো।

"এতে খুব একটা লাভ হবে না," বলে প্রফেসারও মিঃ গ্রুণ্ডআইসের পেট বরাবর কষে একটা ঘুসি ঝাড়লো। ঘুসির চোটে কাউন্টারের উপর কোনো রকমে আঁকড়ে-কুঁকড়ে দাঁড়ালো লোকটা।

কি হচ্ছে দেখার জন্য ব্যাংকের লোকেরা সব দৌড়ে এলো সেখানে। তখন গুস্তভ জোরে তিনবার তার ভেঁপু বাজিয়ে দিলো। ম্যানেজার তাঁর খাস-কামরা থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে দরোজা ঠেলে হুড়মুড়িয়ে দশটা ছেলে ঢুকে মিঃ গ্রুন্ডআইসকে ঘিরে দাঁড়ালো। তাদের সামনে ছিলো এমিল। ম্যানেজার জানতে চাইলেন, "কি হচ্ছে এখানে?"

রাগে কাঁপতে কাঁপতে মিঃ গ্রুন্ডআইস বললো, "এই ছোকরাদের এমন আস্পর্ধা; বলে কিনা যে নোটগুলো এখানে ভাঙাতে এনেছি সেগুলো চুরি-করা।"

এমিল লাফিয়ে চিৎকার করে বললো, "চুরিই তো করেছেন। গতকাল বিকেলে নোটগুলো ইনি আমার কাছ থেকে চুরি করেছেন—একটা পাঁচ আর দু'টো এক পাউন্ডের নোট। নয়স্টডট্ থেকে আসা বার্লিনের ট্রেনে উঠেছিলাম আমরা। আমি মাঝপথে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

"প্রমাণ করতে পারো তুমি?" ক্যাশিয়ার কঠোর সুরে বললো।

"এক সপ্তাহ ধরে বার্লিনে আছি আমি," বৌলার টুপি পরা লোকটা কোমল স্বরে হেসে বললো। "কাল সারাদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শহরেই কাজে ব্যস্ত ছিলাম আমি।"

"মোটেই নয়! মিথ্যে কথা।" এমিল চিৎকার করে বললো। রাগে তার প্রায় কান্না আসছিলো।

"এই ভদ্রলোক যে গতোকাল তোমার সাথে ট্রেনে ছিলেন এ কথা প্রমাণ করতে পারো তুমি?" বেশ কড়া গলায় বললেন ম্যানেজার।

"অবশ্যই পারবে না সে," অবজ্ঞার সুরে বললো চোর।

"ট্রেনে যদি লোকটার সাথে সে একাই থাকে তাহলে অবশ্য কোনো সাক্ষী থাকার কথা নয়," কেরানীদের একজন মন্তব্য করলো। এমিলের উদ্বেগের সাথে ছেলেরাও এ ওর দিকে তাকাতে লাগলো।

"একজন সাক্ষী অবশ্য আমি আনতে পারি," সহসা এমিল খুশি হয়ে বললো। "তিনি গ্রস-গ্রুনাউ-এর মিসেস জ্যাকব। আমি যখন ট্রেনে উঠি তখন উনি সে কামরায় ছিলেন। অবশ্য অল্প পরেই তিনি নেমে যান। নয়স্টডট্-এর মিঃ কুর্জাল্সকে তাঁর কথা বলতে তিনি আমায় বলেছিলেন। আমি নয়স্টডট্-এ থাকি কিনা!"

কথাটা শুনে ম্যানেজার চোরকে বললেন, "তাহলে আপনাকে অন্য জায়গায় দেখেছে এমন একজন সাক্ষী আনতে হবে। পারবেন তো?"

"নিশ্চয়ই," দৃঢ়তার সাথে বললো মিঃ গ্রুন্ডআইস। "রাস্তার অপর দিকে হোটেল ক্রাইডে থাকছি আমি।"

গুস্তভ বলে উঠলো, "সে তো শুধু গতকাল সন্ধ্যা থেকে। আমি জানি। ইনি ঘর ভাড়া করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লিফ্ট্-বয়ের ছদ্মবেশে আমিও সেখানে ছিলাম।"

কথাটা শুনে ব্যাংকের কেরানীরা যেন মুচকি হাসলো। তারা ছেলেদের পক্ষ নিতে শুরু করেছে।

ম্যানেজার বললেন, " তাহলে, স্যার, আপাতত নোটগুলো এখানে জমা রাখতে হবে মিঃ—মিঃ—" ততক্ষণে তিনি পুরো ঘটনাটা লিখে রাখার জন্য কাগজ বার করলেন।

"এনার নাম গ্রুন্ডআইস," এমিল ম্যানেজারকে জানিয়ে দিলো।

এ কথায় বৌলার টুপি পরা লোকটা সশব্দে হেসে উঠলো। সে বললো, "আমার নাম মুলার। ওরা ভুল করেছে, দেখলেন তো?"

দারুণ চটে গিয়ে এমিল বললো, "কী মিথ্যেই না ইনি বলতে পারেন। ট্রেনে তিনি নিজেই আমাকে বলেছেন তাঁর নাম গ্রুন্ডআইস।" ক্যাশিয়ার শান্তভাবে বললেন, "আপনি কে তা প্রমাণ করার মতো কাগজপত্র আছে কি?"

চোর বললো, "দুর্ভাগ্যবশত আমার সাথে নেই। তবে আপনারা এক মিনিট সময় দিলে আমি হোটেলে গিয়ে নিয়ে আসতে পারি।"

"একে বিশ্বাস করবেন না", এমিল চেঁচিয়ে বললো। "নোটগুলো আমার, এগুলো আমাকে ফেরৎ নিতে হবেই।"

"ঠিক, ঠিক। কিন্তু তোমার কথা সত্যি হলেও ব্যাপারটা অতো সোজা নয়।" ক্যাশিয়ার বললেন। "কেমন করে তুমি প্রমাণ করবে যে, নোটগুলো আসলে তোমারই? ওগুলোর নম্বর লিখে রেখেছো কি? অথবা পেছনে নিজের নাম লিখে রেখেছো?"

"না। তা করি নি," এমিল রেগে উত্তর দিলো। "কখনো চুরি যাবে এটা ভাবি নি। কিন্তু যাই বলুন না কেন নোটগুলো আমারই। আমার নানীর কাছে নিয়ে আসার জন্য মা আমাকে সেগুলো দিয়েছিলেন। নানী থাকেন ১৫ নম্বর শুমান স্ট্রীটে।

"নোটগুলোর উপর কোনো দাগ-টাগ আছে কিনা দেখেছিলে?" তাকে সাহায্য করার জন্য ক্যাশিয়ার ইঙ্গিত করলেন।

এমিল মাথা নেড়ে বললো, "না, তা-তো দেখিনি।" চোর বললো, "শুনুন আপনারা। আমি হলফ্ করে বলছি নোটগুলো আমার। বাচ্চা একটা ছেলের কাছ থেকে চুরি করতে পারি—আমাকে দেখে এরকম মনে হয়?"

এমিল সহসা আর একবার লাফিয়ে উঠলো।

"একটু দাঁড়ান," সে চেঁচিয়ে উঠলো। গলা শুনে মনে হলো বুকে থেকে যেন তার ভারি একটা বোঝা নেমে গেলো। "এখন মনে পড়ছে। যে খামটায় নোটগুলো ছিলো সেটিসহ নোটগুলো আমি আলপিন দিয়ে গেঁথে রেখেছিলাম। নোট তিনটার গায়ে নিশ্চয়ই আল্‌পিনের ফুটো আছে।"

নিশ্বাসের একটা শব্দ শোনা গেলো। সবাই নীরব। ক্যাশিয়ার নোটগুলো আলোর দিকে মেলে ধরলেন। চোরটা একপা পেছনে হটলো। নার্ভাস হয়ে ম্যানেজার কাউন্টারের উপর আঙুল দিয়ে টোকা দিচ্ছিলেন।

"ছেলেটির কথা ঠিক।" উত্তেজনায় ক্যাশিয়ারের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছে। "এই তো—সত্যিই-- নোটগুলোর পিনের ফুটো দেখা যাচ্ছে।"

"আর এই সেই আলপিন যেটা দিয়ে ফুটো করেছিলাম," এমিল বেশ গর্বের সাথে বিজয়ীর ভঙ্গিতে বললো। আলপিনটা কাউন্টারের উপর রাখলো সে। "এটা আমার আঙুলেও ফুটেছিলো।"

এ কথা শোনা মাত্র চোর ঘুরে দাঁড়িয়ে বিদ্যুতের মতো দৌড় দিলো দরজার দিকে। ছেলেদের মধ্য দিয়েই গেলো সে—এত জোরে যে অনেকেই ধাক্কায় ছিটকে পড়লো। তারপর সে দরোজা খুলে মুহূর্তে বেরিয়ে গেলো বাইরে।

"ধরো ওকে," ম্যানেজার চিৎকার করে উঠলেন আর সবাই ছুটে গেলো দরোজার দিকে। তারপর বাইরে তারা দেখলো অন্যা ছেলেরা থামিয়ে দিয়েছে তাকে। কেউ ওর হাত ধরেছে, কেউ ধরেছে পা—আর কেউ কেউ কোট ধরে টানাটানি করছে। সে নিজেকে মুক্ত করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছিলো, কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। অনেকগুলো ছেলে ছেঁকে ধরেছে তাকে। এর মধ্যেই একজন পুলিশ ছুটে এসেছে ওদের দিকে। পনি তার বাই-সাইকেলে চড়ে বসে আছে ওকে ধরার জন্যে।

ব্যাংক ম্যানেজার বললেন, "ওকে গ্রেপ্তার করা হোক। ও যে ট্রেনের চোর এ কথা ভাবার অনেক কারণ আছে।"

নোটগুলো আর পিনটা এক দৌড়ে নিয়ে এসে ক্যাশিয়ার ছুটি চাইলেন। তারপর তিনি আর সেই পুলিশ গ্রুন্ডআইসকে মাঝখানে রেখে নিয়ে চললেন থানায়। তাদের পেছনে চললো কমপক্ষে প্রায় একশোজন ছেলে।

পনি কিছুক্ষণ ওদের সাথে সাথে চললো তার সাইকেলে চেপে। তারপর একটা মোড়ে পৌছে সে চেঁচিয়ে বললো, "গুড-বাই, এমিল। আমি বাড়ি যাচ্ছি। সব কথা জানাতে হবে ওদের।"

এমিল বললো, "আচ্ছা, যাও। সবাইকে আমার ভালোবাসা জানিয়ো আর বলবে যে ডিনারের সময় আমি ঠিক হাজির থাকবো।"

মোড় ঘুরতে ঘুরতে ঘাড় ফিরিয়ে পনি বললো, "দেখে মনে হচ্ছে ইস্কুলের ছেলেদের সাথে পিক্‌নিক্ করতে বেরিয়েছো তুমি।"

তারপরই সেই আগের মতো পাগলের ন্যায় সাইকেলের ঘন্টি বাজাতে বাজাতে সে চলে গেলো চোখের আড়ালে।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার

সেই অদ্ভুত মিছিলটা পৌঁছলো সবচেয়ে কাছের থানায়। যে পুলিশ চোরটাকে ধরেছিলো সে ডিউটি সার্জেন্টকে ঘটনার কথা জানালো। এমিল অনেক খুঁটি-নাটি কথা জানালো। তাকে বলতে হলো তার নাম, ঠিকানা, জন্মের তারিখ ও জন্মস্থানের নাম। সার্জেন্ট একটা মোটা খাতায় সবকিছু লিখে নিলেন।

"আপনার নাম কি?" সার্জেন্ট চোরকে জিজ্ঞেস করলেন।

"হার্বার্ট কিস্‌লিং" বললো সে।

এমিল, গুস্তভ এবং প্রফেসার তার সঙ্গে এসেছিলো। তার কথায় তারা হো-হো করে হেসে উঠলো। ক্যাশিয়ার সবেমাত্র সেই সাত পাউন্ড সার্জেন্টকে দিয়েছেন। তিনিও যোগ দিলেন তাদের হাসিতে।

গুস্তভ বললো, "আজব লোক বটে ইনি। প্রথমে নিজের নাম বলেছিলেন গ্রুন্ডআইস, তারপর মুলার আর এখন কিস্‌লিং। আসল নামটা যে কি জানতে ইচ্ছে করছে আমার।"

"চুপ করো," গর্জন করে উঠলেন সার্জেন্ট। "শিগগিরই আসল নামটা আমরা বের করে ফেলবো।"

তারপর মিঃ গ্রুন্ডআইস-মুলার-কিস্‌লিং বললো যে তার ঠিকানা হোটেল ক্রাইড এবং জানালো তার জন্মতারিখ ও জন্মস্থানের নাম। সে বললো, নিজের পরিচয় প্রমাণ করার মতো কোনো কাগজপত্র নেই তার।

"গতোকাল এখানে আসার আগে আপনি কোথায় ছিলেন? সার্জেন্ট প্রশ্ন করলেন।

চোর বললো, "গ্রসগুনাউ-তে।"

"বাজি রেখে বলতে পারি এটা আর একটা ডাহা মিথ্যে," প্রফেসার বলে উঠলো।

"তুমি চুপ করো," সার্জেন্ট আবার ধমকে উঠলেন। "যথাসময়ে প্রত্যেকটি বিবৃতি যাচাই করে দেখা হবে।"

ক্যাশিয়ার জানতে চাইলেন তিনি এখন যেতে পারেন কিনা। তাঁকেও তাঁর নাম-ঠিকানা রেখে যেতে হলো। পিঠ চাপড়ে এমিলকে উৎসাহিত করলেন তিনি, তারপর কাজে ফিরে গেলেন।

সার্জেন্ট বললেন, "মিঃ কিসলিং, নয়স্টড-টের এই স্কুলছাত্র এমিল টিশবাইনের কাছ থেকে আপনি সাত পাউন্ড চুরি করেছিলেন গতোকাল বিকেলে ট্রেনে আসার সময়?"

"হ্যাঁ," বিষণ্ন মুখে স্বীকার করলো চোর। "কেন যে চুরি করেছিলাম সে আমিও জানিনে। সে কোনায় ঘুমিয়ে পড়েছিলো। তার টাকা-ভর্তি খামটা পড়ে গিয়েছিলো পকেট থেকে। ওটা তুলে নিয়ে শুধুমাত্র কৌতূহলের বশে দেখছিলাম ভেতরে কি আছে। তারপর—আমার কাছে টাকা-পয়সা না থাকায়—"

"এ কথাটাও সত্য নয়!" এমিল গর্জে উঠলো। "ভেতরের পকেটে পিন দিয়ে গেঁথে রেখেছিলাম আমি খামসহ নোটগুলো। সেগুলো পড়তেই পারে না।"

"আর ওঁর কাছে যে টাকা-কড়ি কিছু ছিলোনা সেও হতে পারে না।" প্রফেসার বলে উঠলো। "তাহলে তো কাল বিকেলে ক্যাফেতে খাবার আর পানীয়ের দামটা দেবার জন্য এমিলের নোটই ভাঙাতে হতো। ট্যাক্সি ভাড়াও উনি দিয়েছেন নিজের থেকে।"

"ছেলেরা, কথার মধ্যে কথা বলবে না তোমরা," আবার গর্জন করে উঠলেন সার্জেন্ট। "যথাসময়ে সবকিছুই আমরা যাচাই করে দেখবো।" তারপর তিনি খাতায় আরো অনেক কিছুই লিখে নিলেন।

"সার্জেন্ট, আমাকে এখন যেতে দিলে আমি খুব অনুগৃহীত হবো," খুব বিনীতভাবে বললো চোরটা। "আমি আমার ভুল স্বীকার করেছি। আমার ঠিকানাও দিয়েছি আপনাকে। আমি বার্লিনে এসেছি বিশেষ একটা কাজে। এখন গিয়ে কাজটা শেষ করতে চাই আমি।"

"আপনার সাহস তো কম নয়!" সার্জেন্ট বলে উঠলেন। টেলিফোন তুলে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে ফোন করে জানালেন একজন ট্রেন-চোর ধরা পড়েছে। তাকে নিয়ে যাবার জন্য গাড়িও পাঠাতে বললেন তিনি।

"আমার টাকাটা কখন ফেরত পাবো ?" এমিল অধীরভাবে জানতে চাইলো।

উত্তরে সার্জেন্ট বললেন, "সেজন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার-এ যেতে হবে তোমাকে। সেখানেই সবকিছু করা হবে।"

ফিস্‌ফিস্ করে গুস্তভ বললো, "এমিল, আমার মনে হচ্ছে 'ব্ল্যাক-মারিয়ায়' চেপে যাবে তুমি।"

"মোটেই না," সার্জেন্ট বললেন। "টিশ্‌বাইন! তোমার কাছে পয়সা-কড়ি কিছু আছে ?"

এমিল বললো, "আছে স্যার! ছেলেরা গতোকাল কিছু জোগাড় করেছিলো আমার জন্য। আর হোটেল ক্রাইডের হল-পোর্টার দশ শিলিং ধার দিয়েছেন আমাকে।"

"বলিহারি দিই তোমাকে। সবকিছুই একেবারে নিখুঁতভাবে করেছো তোমরা, ক্ষুদে শয়তানরা।" আবার গর্জন করে বললেন সার্জেন্ট। তবে এবারের গর্জনটা খোশ-মেজাজী। "বহুত আচ্ছা! টিশ্‌বাইন, মাটির তলার ট্রেন ধরে আলেকজান্ডার স্কোয়ারে চলে যাও। সেখানে সার্জেন্ট লুডউইগের সঙ্গে দেখা করবে। তখন জানতে পারবে পরে আর কি করতে হবে। ভয় করো না, তোমার নোটগুলো তুমি ফেরত পাবেই।"

"প্রথমে গিয়ে পোর্টারকে দশ শিলিং ফেরত দিয়ে এলে কোনো আপত্তি আছে?" এমিল জিজ্ঞেস করলো।

"না, মোটেই না।"

কয়েক মিনিট পর পুলিশের গাড়ি এসে পৌছালো। মিঃ গ্রুন্ডআইসকে বলা হলো তাতে উঠতে। সার্জেন্ট রিপোর্টের একটা কপি এবং সেই সাত পাউন্ড গাড়িতে যে পুলিশ ছিলেন তাঁকে দিলেন। এমিলের সেই আলপিনটাও রিপোর্টের সাথে গেঁথে দেয়া হলো।

তখন গাড়িটা চলে গেলো। ছেলেদের ভিড়টা তখনো বাইরের ফুটপাতে জাকিয়ে ছিলো। তারা চোরটার দিকে তাকিয়ে চিৎকার শুরু করে দিলো। সে কিন্তু এসব কিছু খেয়ালই করলো না। বরং এমন ভাবে নাক উঁচু করে বসে রইলো যেন এ রকম একটা গাড়িতে চেপে যাচ্ছে বলে তার বেশ গর্ব হচ্ছে।

এমিল সার্জেন্টের সাথে হ্যান্ডশেক করে সাহায্যের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানালো। বাইরে এসে ছেলেদের বললো, সে এবার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স থেকে নোটগুলো ফেরত পাবে। পিছু ধাওয়া করা শেষ হয়েছে। এতে তারা কলরব করতে করতে ভেড়ার পালের মতো দল বেঁধে চলে গেলো। শুধু সেই ডিটেকটিভ দলের নেতারা এমিলের সঙ্গে প্রথমে হোটেলে তারপর মাটির তলার ইস্টিশানে গেলো তাকে আলেকজান্ডার স্কোয়ারে যাবার ট্রেনে তুলে দিতে।

"বাচ্চা টুইসডেকে টেলিফোন করতে ভুলো না," ওদের মনে করিয়ে দিলো। "পুরো ঘটনাটা তাকে জানিয়ো।" তারপর সে সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানালো ওদের। বললো, বাড়ি যাবার আগে সে নিশ্চয়ই ওদের সাথে দেখা করবে। শেষে সে বললো, "তোমাদের ধারটাও শোধ করে দিতে হবে আমাকে।"

"একবার চেষ্টা করেই দেখো—তাহলেই বুঝবে মজাটা," গুস্তভ বললো। "আমি তোমাকে—ও, ভালো কথা, মনে পড়েছে এবার, আমাদের লড়াইটা এখনো হয় নি। মনে আছে তো, তোমার সেই কিম্ভূত মজার স্যুটটা নিয়ে—?

"আমার কি যে ভালো লাগছে," একহাতে গুস্তভ, অন্য হাতে প্রফেসারের একটা হাত ধরে বললো এমিল। "আমি লড়াইটা ফিরিয়ে নিচ্ছি। তোমরা যা করেছো তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তোমাকে ভাই ঘুসি মারতে পারবো না আমি।"

"সে চান্সই তুমি পাবে না," গুস্তভ বেশ খুশি হয়ে বললো।

তারপর ওরা তিনজন একসাথে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে গেলো। লম্বা একটা বারান্দা দিয়ে তাদেরকে অপরাধী তদন্ত বিভাগের সার্জেন্ট লুডউইগের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। বারান্দার দু'পাশে সব অফিসগুলোর দরোজা বন্ধ। তিনি তখন সবে লাঞ্চ খেতে শুরু করেছিলেন।

মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে সার্জেন্ট বললেন, "এমিল স্টুলবাইন, শখের গোয়েন্দা? তোমার সম্বন্ধে একটা ফোন পেয়েছি। সুপারিনটেনডেন্ট তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। আমার সঙ্গে এসো।"

"আমার নাম টিশবাইন," এমিল তাঁকে শুধরে দিলো।

"ওই একই কথা," স্যান্ডউইচে আর একটা কামড় বসিয়ে সার্জেন্ট বললেন।

প্রফেসার এমিলকে বললো, "আমরা তোমার জন্য বসে থাকবো এখানে"

গুস্তভ যোগ করলো, "বেশি দেরি করো না কিন্তু। কাউকে ওভাবে চিবুতে দেখলে আমার দারুণ খিদে লেগে।"

আরো নানা করিডোর দিয়ে এমিলকে নিয়ে চললেন সার্জেন্ট লুডউইগ। প্রথমে বাঁয়ে, তারপর ডাইনে, তারপর আবার বাঁয়ে গিয়ে তিনি অবশেষে একটা দরোজায় টোকা দিলেন। ভেতর থেকে শব্দ হলো, "চলে এসো।" সার্জেন্ট লুডউইগ তখনো চিবুচ্ছিলেন, হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে তিনি বললেন, "ক্ষুদে গোয়েন্দা, এমিল টিশবাইন। আপনি তার সম্পর্কে সব শুনেছেন, স্যার।"

"আমার নাম টিশবাইন," এমিল আবার বললো।

"নামটা বেশ ভালোই," বিড় বিড় করে বললেন সার্জেন্ট। তারপর এমন জোরে এমিলকে ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেন যে আর একটু হলেই সে পড়ে যেতো হুমড়ি খেয়ে।

সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট বেশ হাসি-খুশি লোক। এমিলকে একটা বেশ আরামদায়ক চেয়ারে বসালেন তিনি। তারপর তার কাছ থেকে পুরো ঘটনাটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালো করে শুনে নিলেন।

এমিলের কথা শেষ হলে গম্ভীরভাবে বললেন তিনি, "বুঝলাম। এখন তোমার নোটগুলো তুমি ফেরত পাবে।"

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ," স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললো সে, যখন নোটগুলো পকেটে রাখছিলো। এবার নোটগুলো খুব সাবধানে রাখবে সে। "আর কাউকে চুরি করতে দিও না আবার," সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট বললেন।

এমিল প্রতিজ্ঞা করলো, "কক্ষনো দেবো না। সোজা নোটগুলো নানীর কাছে নিয়ে যাবো আমি।"

"সেটাই ভালো। তাঁর কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। তোমার বার্লিনের ঠিকানা আমার দরকার। এখানে তো আরো কয়েকদিন আছো?"

"হ্যাঁ, আশা করছি," এমিল বললো। "ঠিকানা হচ্ছে ১৫ শ্যুমান স্ট্রীট, কেয়ার অফ হেইমবোল্ড। এটা আমার খালুর নাম। আমার খালার নামও।"

"তোমরা ছেলেরা বেশ ভালো একটা কাজ করেছো," মোটা একটা চুরুট ধরিয়ে কর্তাব্যক্তিটি বললেন।

"সত্যি—অন্য ছেলেরাও ভারী চমৎকার," উৎসাহের সাথে এমিল বলতে লাগলো। "গুস্তভ—যার কাছে মোটরভেঁপু আছে আর প্রফেসার, আর বাচ্চা টুইসডে, আর ক্রুম, আর মিটলার ভাইরা,—আর সবাই, সবাই। পুরো ব্যাপারটা দারুণ মজার লাগছিলো। সংগঠনের ব্যাপারে প্রফেসার একেবারে পয়লা নম্বরের!"

"ভালো। তুমি নিজেও কিছু কম নও," সিগারে টান দিতে দিতে সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট বললেন।

"আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?" এমিল বললো। "মিঃ গ্রুন্ডআইসের কি হবে? আর ওর আসল নামটাই বা কি?"

"তার ফটো তোলা আর আঙুলের ছাপ নেবার জন্যে তাকে 'আইডেন্টিফিকেশান ব্যুরোতে' (সনাক্ত করণ বিভাগে) পাঠানো হয়েছে। তারপর আমরা দেখবো 'রোগস্ গ্যালারিতে' তার সম্পর্কে কোনো কিছু আছে কিনা।"

"সেটা আবার কি?" এমিল জানতে চাইলো।

"যে সব অপরাধীর আগে শাস্তি হয়েছে সেখানে তাদের সম্বন্ধে নানা খবর আমরা রাখি। যেসব লোক এখনো ধরা পড়ে নি, অথচ যারা কোনো না কোনো অপরাধে জড়িত তাদের আঙুলের ছাপ, পায়ের ছাপ এবং নানা খবরও আমরা সেখানে রেখে দিই। যে লোকটা তোমার নোট চুরি করেছে খুব সম্ভব আগে তার সাজা হয়েছিলো। হয়তো এর মধ্যে আমরা তার সন্ধান করেছি।"

"বুঝলাম এবার। কথাটা আগে ভাবি নি।"

ঠিক তখনই ঝন্ ঝন্ করে টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভার তুলতে তুলতে অত্যন্ত ভদ্রভাবে সুপারিন্টেন্ডেন্ট বললেন, "একটু দাঁড়াও।" তারপর টেলিফোনে বললেন, "কি বললেন?—আমার এখানে এমন কিছু আছে যা দেখে আপনি অবাক হবেন—সোজা আমার ঘরে চলে আসুন।" রিসিভারটা তিনি নামিয়ে রাখলেন। তারপর এমিলকে বললেন, "খবরের কাগজের কয়েকজন ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান।"

"অবাক ব্যাপার! এর মানে কি?"

"তাঁরা তোমাকে অনেক প্রশ্ন করবেন।"

"এ্যা! তার মানে আমার নাম খবরের কাগজে ছাপা হবে?"

"হলে অবাক হব না। স্কুলের একজন ছাত্র চোর ধরেছে—এটা তো একটা জবর খবর।"

দরোজায় টোকা দিয়ে চারজন ভদ্রলোক ঘরে এসে সুপারিন্টেন্ডেন্টের সাথে করমর্দন করলেন। সংক্ষেপে তিনি এমিলের সব কথা তাঁদের বললেন। খসখস করে নোটবইতে তাঁরা সেসব কথা লিখে নিলেন।

রিপোর্টারদের একজন বললেন, "সাংঘাতিক গল্প বটে! গাঁয়ের ছেলের গোয়েন্দা হওয়া।"

"আমার তো মনে হয় ইউনিফরম-ছাড়া গোয়েন্দা করে নিচ্ছেন আপনি ওকে," আর একজন রিপোর্টার হাসতে হাসতে বললেন।

"সোজা পুলিশের কাছে গিয়ে চুরির কথাটা কেন বলনি?" অন্য একজন রিপোর্টার প্রশ্ন করলেন।

কথাটা শুনে এমিলের মনে পড়লো নয়স্টডটের সার্জেন্ট ইয়েশ্‌কের কথা আর স্বপ্নটাও। সে আবার ঘাবড়ে গেলো।

"বল?" সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রশ্ন করলেন।

এমিল আর দেরি করলো না! "নয়স্টড-টে গ্র্যান্ড ডিউক চার্লসের মূর্তিতে আমি চকখড়ি দিয়ে লাল নাক আর গোঁফ এঁকে দিয়েছিলাম," স্বীকার করলো সে। "এবার আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন।"

ওকে অবাক করে দিয়ে ওঁরা পাঁচজন হো হো করে হেসে উঠলেন। সে ভেবেছিলো কথাটা শুনে ওঁদের মুখগুলো গম্ভীর হয়ে উঠবে।

"কি যে বলো," সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট বললেন, "আমরা কি আমাদের সেরা গোয়েন্দাদের মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করতে পারি ?"

"সত্যি বলছেন ? আঃ বাঁচলাম !" এমিল গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। তারপর একজন রিপোর্টারের দিকে মুখ ফেরালো।

"আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?" সে বললো।

"কই না তো।"

"গতোকাল ১৭৭ নম্বর ট্রামে আপনি আমার ভাড়া দিয়েছিলেন। আমার কাছে তখন পয়সা-কড়ি ছিলো না," এমিল তাঁকে মনে করিয়ে দিলো।

"হ্যাঁ—তাইতো। এবার মনে পড়ছে। ভাড়ার পয়সাটা ফেরত দেয়ার জন্য তুমি আমার ঠিকানা চেয়েছিলে।"

"হ্যাঁ—এখন আমি সেটা ফেরত দিতে পারি," বলতে বলতে সে পকেট থেকে কিছু পেনি বের করলো।

"দয়া করে এখন নিয়ে নিন," সে বললো।

"আরে না-না, ঠিক আছে," তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন সেই তরুণ ভদ্রলোক। "তোমার নামটাও তুমি আমায় বলছিলে, তাই না ?"

"হ্যাঁ। এমিল টিশবাইন।"

"আর আমার নাম কাস্টনার," সাংবাদিক বললেন। তারপর তিনি হ্যান্ডশেক করলেন এমিলের সাথে।

"আপনারা তো দেখছি আগেই থেকেই চেনা। চমৎকার!" বেশ জোরে বলে উঠলেন সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট।

"আমার সঙ্গে আমাদের কাগজের অফিসটা দেখতে যাবে, এমিল ?" মিঃ কাস্টনার বললেন। "পথে কোনো ক্যাফেতে বসে আমরা ক্রিম দেয়া কেকও খেয়ে নিতে পারি।"

"আমিই আপনাকে খাওয়াতে চাই," এমিল বললো। কথাটা শুনে বেশ মজা পেলেন সাংবাদিকরা। তাঁরা বললেন, "তুমি তো দেখি কারো উপর নির্ভর করতে চাও না।" মিঃ কাস্টনার বললেন, "না-না। খরচটা আমিই দেবো।"

একগাল হেসে এমিল বললো," অনেক অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু গুস্তভ আর প্রফেসার আমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে।"

"তাহলে তাদেরও যেতে হবে," মিঃ কাস্টনার বললেন।

অন্য সাংবাদিকরা এমিলকে আরো কিছু প্রশ্ন করলেন। আর এমিলের উত্তরটা তাঁরা নোটবইতে লিখে নিলেন। একজন সাংবাদিক সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টকে জিজ্ঞেস করলেন, এটাই গ্রুন্ডআইসের প্রথম অপরাধ কিনা।

"আমার সন্দেহ হচ্ছে," তিনি উত্তর দিলেন। "মনে হয় আমাদের জন্য আরো বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছে। ঘণ্টাখানেক পরে আমাকে ফোন করলে সেটা আপনাদের জানতে পারবেন বলে মনে হয়।"

তারপর সবাই বিদয়ে দিলেন। এমিল মিঃ কাস্টনারের সাথে সার্জেন্ট লুডউইগের ঘরে ফিরে এলো। তিনি তখনো খেয়ে চলছিলেন। এমিলকে দেখে বেশ হেসে তিনি বললেন, "এসো-এসো, উবায়বাইন।"

"টিশবাইন," এমিল বললো।

তারা গুস্তভ আর প্রফেসারকে সাথে নিলো। মিঃ কাস্টনার ছেলেদের নিয়ে তাঁর গাড়িতে উঠলেন। তারপর গাড়ি চালিয়ে একটা ক্যাফেতে গেলেন প্রথমে। পথের মধ্যে গুস্তভ একবার তাঁর ভেঁপু বাজালে মিঃ কাস্টনার চমকে লাফিয়ে উঠলেন। ছেলেরা এতে হেসে গড়াগড়ি খেলো। ক্যাফেটা প্রথম শ্রেণির। ক্রিম দেয়া চেরি-কেক খেতে খেতে মিঃ কাস্টনারকে তারা তাদের অভিযানের সব ঘটনা বললো—নিকোলাস স্কোয়ারে যুদ্ধ-পরিষদের কথা, ট্যাক্সিতে চোরকে অনুসরণ করার কথা, আর হোটেলে রাতের কথা যখন লিফ্‌ট্-বয়ের ছদ্মবেশ নিয়েছিলো গুস্তভ এবং সবশেষে ব্যাংকে সেই দারুণ হৈ-হল্লার কথা।

সব কথা শুনে মিঃ কাস্টনার বললেন, "তোমাদের মতো গুণী ছেলের জুড়ি নেই।" শুনে তারা এমন খুশি হলো যে আর একটা করে চেরি-কেক খেয়ে ফেললো।

তারপর তারা আলাদা হয়ে গেলো। গুস্তভ আর প্রফেসার বাসে চড়ে বাড়ি গেলো। তারা কথা দিলো যে বাচ্চা টুইস্‌ডে-কে টেলিফোন করবে তারা। এমিল মিঃ কাস্টনারের সাথে মোটরে চড়ে তাঁর অফিসে গেলো।

যে-বাড়িতে খবরের কাগজ ছাপা হয় সেটা একটা বিরাট বাড়ি। প্রায় পুলিশ হেড-কোয়ার্টারের মতো বড়। তবে এখানে লোকেরা আরো বেশি ব্যস্ত। করিডোর দিয়ে লোকেরা এমন দৌড়ে আসছে-যাচ্ছে যেন তারা অব্‌স্টেকল্ রেস্ ছুটছে। তারা একটা ঘরে এলো। সেখানে ডেস্কের সামনে সুন্দরী একটা মেয়ে বসে। চুলগুলো তার সোনালি রঙের। মিঃ কাস্টনার দেরি না করে সোজাসুজি এমিলের গল্পটা মুখে মুখে বলে যেতে

লাগলেন আর মেয়েটি সেটা টাইপ করে চললো। বলতে বলতে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন তিনি। আর থেকে থেকে এমিলকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "ঠিক হচ্ছে তো?" এমিল মাথা হেলিয়ে জানাতে লাগলো ঠিকই বলছেন তিনি। আর সঙ্গে সঙ্গে খট্খট্ করে টাইপ চলতে লাগলো।

বলা শেষ হলে সুপারিন্টেন্ডেন্টকে ফোন করলেন তিনি। এমিল শুনলো তিনি বললেন, "কি বললেন?—অবাক কাণ্ড—না? ঠিক আছে আমি একটি কথাও বলবো না—কি? —ঠিক আছে—শুনে খুব খুশি হলাম—অনেক ধন্যবাদ—একটা গল্পের মতো গল্প বটে!" তিনি টেলিফোনটা তুলে রাখলেন, তারপর এমিলের দিকে এমন ভাবে তাকালেন যেন এর আগে তিনি ওকে আর ককনো দেখেন নি।

"তোমার একটা ছবির দরকার আমার, এমিল। চলো, এক্ষুনি চলো, জলদি।"

"এ্যাঁ," দারুণ অবাক হয়ে বলে উঠলো এমিল।

"ছবি ? আমার ? কেন ?"

কিন্তু সে বেশ বাধ্যভাবে মিঃ কাস্টনারের সঙ্গে লিফ্‌টে চড়ে তিনতলা উপরে গেলো। তারপর গেলো একটা খুব আলোকিত ঘরে। অনেক ক'টি বড় বড় জানালা সেখানে। এমিল তার চুল ঠিক করে নিলো। তারপর ওর ছবি তোলা হলো।

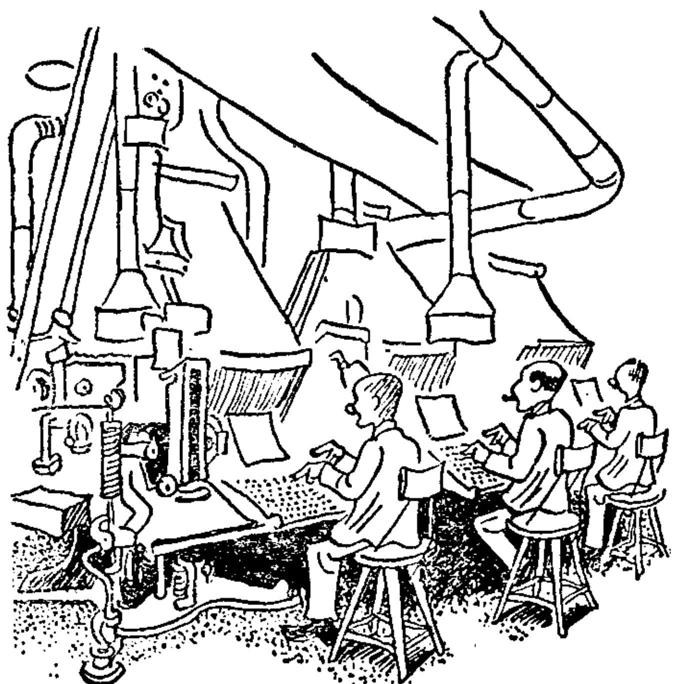

সবশেষে ওরা এলো কম্পোজিটারদের রুমে। সেখানে এতো শব্দ, মনে হলো যেন হাজারটা টাইপরাইটার একসাথে খটখট শব্দ করে চলেছে। সেখানে মিঃ কাস্টনার একজনকে সেই কাগজটা দিলেন যেটা সুন্দরী মেয়েটা টাইপ করেছিলো।

"বেশ গুরুত্বপূর্ণ গল্প এটা," তিনি বললেন। "এ নিয়ে আলাপ করবার জন্য এক মিনিটেই ফিরে আসছি আমি। এই ছেলেটাকে ওর নানীর কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে আগে।"

তারপর তারা লিফ্‌টে চড়ে একতলায় নেমে এলো। রাস্তায় এসে একটা ট্যাক্সি ডেকে মিঃ কাস্টনার এমিলকে তাতে তুলে দিলেন।

"এই ছেলেটাকে যত তাড়তাড়ি পারেন ১৫ নম্বর শুমান স্ট্রীটে পৌছে দিন।" ড্রাইভারকে ভাড়াটা দিয়ে দিলেন তিনি। এমিলের অবশ্য সেটা পছন্দ হলো না। তখন এমিলের সাথে আবার করমর্দন করলেন তিনি। বাড়ি পৌছে তোমার মাকে আমার অভিনন্দন জানিও। তিনি নিশ্চয়ই তোমার খুব প্রিয়।

উত্তরে এমিল বললো, "হ্যাঁ, মাকে আমি খুব ভালোবাসি।"

"হ্যাঁ, আর একটা কথা," ট্যাক্সি স্টার্ট দিলে মিঃ কাস্টনার ডেকে বললেন, "আজকের সন্ধের কাগজটা পড়তে ভুলে যেওনা যেন। দেখো তাতে কি লেখা আছে। এমন অবাক হবে জীবনে যা কোনোদিন হও নি।"

জানালা দিয়ে মুখ বের করে এমিল হাত নাড়াতে লাগলো। ট্যাক্সিটা একটা মোড় ঘুরে চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত মিঃ কাস্টনারও হাত নাড়াতে লাগলেন।

এমিলের অনেক টাকা

উল্টার ডেন লিনডেন নামে বার্লিনের বিখ্যাত রাস্তা দিয়ে ট্যাক্সিটা যখন যাচ্ছে এমিল তখন ড্রাইভার আর তার মাঝখানের কাঁচের পার্টিশানে তিনবার টোকা দিলো। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলো ট্যাক্সি।

"আমরা কি প্রায় পৌঁছে গেছি?" এমিল বললো।

"হ্যাঁ," ড্রাইভার উত্তর দিলেন।

"আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এইমাত্র মনে পড়লো আমার স্যুটকেস আর নানীর জন্য আনা ফুলের তোড়াটার কথা। কাইজার অ্যাভিনিউ-র ক্যাফে জস্তিতে ওগুলো আমি গতোকাল রেখে এসেছি। এখন নিয়ে আসতে হবে। আপনি আমাকে আগে একটু সেখানে নিয়ে যাবেন?"

ড্রাইভার বললেন, "ভালো। তবে সেটা নির্ভর করে তোমার কাছে কত টাকা আছে তার উপর। যদি সেই ভদ্রলোক যা দিয়েছেন তাতে ভাড়া না কুলোয়—?"

এমিল খুশি হয়ে বললো, "অনেক। ঐ ফুলগুলো আমাকে আনতেই হবে।"

"তাহলে ঠিক আছে," ড্রাইভার বললেন। তারপর তিনি গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ব্রান্ডেন বুর্গ গেট আর সিটি পার্কের মধ্য দিয়ে নোলেনডর্ফ স্কোয়ারের দিকে চালালেন। সবকিছুই এখন ঠিক আছে। স্কোয়ারটাকে এমিলের কাছে বিপদহীন এবং মনোরম মনে হলো। কিন্তু সারাক্ষণ সে বুক-পকেটে হাত দিয়ে রাখলো যাতে টাকাটা যেসেখানে আছে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে সে। মট্‌জ্ স্ট্রীট দিয়ে গিয়ে ডাইনে ঘুরলো তারা। তারপর ক্যাফের সামনে এসে দাঁড়ালো। এমিল ভেতরে গিয়ে কাউন্টারের মেয়েটিকে বললো গতোকাল রেখে যাওয়া তার ফুল আর স্যুটকেসটা দিয়ে দিতে। মেয়েটি জিনিসগুলো দিলো তাকে। সে মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার গাড়িতে উঠে এলো।

"এবার ঠিক আছে," সে বললো। "এখন নানীর কাছে যেতে আর কোনো বাধা নেই।"

যে পথ দিয়ে তারা এসেছিলো সে পথ দিয়ে ফিরে চললো ট্যাক্সি। স্প্রি-নদী অতিক্রম করলো তারা, তারপর পুরোনো কয়েকটা রাস্তা পেরুলো, পেছনে ফেলে এলো বেশ কয়েকটা শাদা পুরোনো বাড়ি। এমিল ভাবলো, সে যদি আরো ভালো করে সব দেখতে পারতো! স্যুটকেসটা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছিলো সে। সেটা খালি ওলট-পালট করছিলো। খোলা জানালা দিয়ে হাওয়ার ঝাপ্‌টা যে কাগজে ফুলগুলো ছিলো তাতে টান মারছে। এমিলের ভয় হলো এই বুঝি ফুল-টুল সব ট্যাক্সির ভেতর থেকে উড়ে যায়।

"থাক, এসে গেছি তাহলে," বলে ট্যাক্সি থেকে নামলো এমিল। "মিটারে কত উঠেছে?"

ড্রাইভার বললেন, "মিটারে যা উঠেছে তার চেয়ে ছ'পেন্স বেশি রয়ে গেছে আমার কাছে।"

উদারতার সাথে এমিল বললো, "সেটা রাখুন। একটা সিগার কিনবেন আপনার জন্যে।"

"ধন্যবাদ, বাছা। আমি সিগার খাই না, তামাক চিবুই," বলে ড্রাইভার ট্যাক্সি হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

এমিলের আত্মীয়েরা থাকতো উপরের ব্লকের একটা ফ্ল্যাটে। তাকে তিন সারি সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হলো উপরে। সে ঘণ্টিটা বাজানো মাত্রই ভিতর থেকে উত্তেজিত কথা-বার্তা শোনা গেলো। তারপর হুশ করে দরোজা খুলে গেলো, সেখানে দাঁড়িয়ে নানী। তিনি তার কাঁধ দু'টো চেপে ধরে একগালে চুমু খেলেন আর অপর গালে আদরের চড় মারলেন। তারপর তাকে ভিতরে টেনে আনতে-আনতে চেঁচাতে লাগলেন, "লক্ষ্মীছাড়া, বিচ্ছু ছেলে কোথাকার!"

অমনি মার্থা-খালা বেরিয়ে বললেন, "কী কাণ্ড! বাছা, তোর সম্পর্কে কত মজার গল্পই না শুনছি।"

পনি বেরিয়ে এলো রান্নাঘর থেকে। পরনে তার মায়ের অ্যাপ্রন। হ্যান্ডশেক করার জন্য কনুইটা এগিয়ে দিলো। "দেখো, আমার হাত দু'টো ভেজা," বলে অভ্যর্থনা জানালো সে। "কাপড়-চোপড় ধুয়ে দিচ্ছিলাম আমি। মেয়েদের কী আর কাজের অন্ত আছে!"

তারপর তারা সবাই বসবার ঘরে গেলো। এমিলকে বসতে হলো সোফায়। ওর নানী আর খালা এমনভাবে তার দিকে তাকিয়ে রাইলো যেন, ছবির গ্যালারির একখানা অয়েল পেইন্টিং সে।

"নোটগুলো পেয়েছো?" পনি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞেস করলো। "নিশ্চয়ই," বলে পকেট থেকে নোটগুলো বার করলো এমিল। একটা পাঁচ পাউন্ড ও আর একটা এক পাউন্ডের নোট সে তার নানীর হাতে দিলো। "এই নাও নানী। মার ভালবাসাও আছে এর সাথে। তিনি বলেছেন গত কয়েক মাসে কিছু পাঠাতে পারেন নি বলে রাগ করোনা যেন। ব্যবসার অবস্থা খুব ভালো নয়। পুষিয়ে দেবার জন্যে বরাবর তিনি যা পাঠান তার চেয়ে কিছু বেশিই পাঠিয়েছেন।"

"ধন্যবাদ, প্রিয় মাণিক আমার।" এক পাউন্ডের নোটটা এমিলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "অতো ভালো গোয়েন্দা হয়েছিস তুই, এই নোটটা তোর।"

"না-না," পিছু হটে বললো এমিল। "এটা আমি নিতে পারি না। সত্যিই পারি না। আমার কাছে এখনো গোটা এক পাউন্ডের একটা নোট আছে। মা ওটা আমাকে দিয়েছিলেন।"

বুড়ি বললেন, "নানী যা বলেন তোমার তা করা উচিত। নোটটা পকেটে গুঁজে নাও, আর এ নিয়ে একটা কথাও বলোনা।"

"নিতে পারবো না আমি কক্ষনো," এমিল আপত্তির সুরে বললো।

পনি বললো, "বোকামি কোরোনা।" আমি হলে তো দু'বার বলতে হতোনা। "না—সত্যি বলছি—নিতে পারবো না।" এমিল শুধু আপত্তি করেই চললো।

"এই যে নোটটা—নাও দিকিনি। না নিলে আমি সত্যিই রাগ করবো," বৃদ্ধা বললেন। "আর রাগলে আমার বাতের ব্যথা বেড়ে যায়।"

তার পকেটে পাউন্ডের নোটটা গুঁজে দিয়ে মার্থা খালা বললেন, "নে-তো বাছা—নিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে দে।"

"আচ্ছা নিচ্ছি, তোমরা যদি তাই চাও," আমতা আমতা করে বললো এমিল। "অনেক ধন্যবাদ নানী।"

তার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি বললেন, "তোর কাছেও আমার কৃতজ্ঞ থাকার কথা।"

তারপর এমিল তাঁকে ফুলগুলো দিলো। সেগুলো রাখার জন্য পনি একটি ফুলদানি নিয়ে এলো। কিন্তু কাগজের মোড়কটা খুলে তারা হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারলো না।

"ওম! এগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে শুকনো লতা!" গালে হাত দিয়ে বললো পনি।

"গতোকাল ডিনারের পর থেকে আর পানি পায় নি ওরা," দুঃখিত-স্বরে বললো এমিল। তাই এগুলো মরে গেলে অবাক হবার কিছু নেই। মা আর আমি যখন এনেছিলাম তখন এগুলো বেশ সতেজ ছিলো।

"সন্দেহ নেই—নিশ্চয়ই তাজা ছিলো," নানী ফুলগুলো ফুলদানিতে রেখে দিলেন।

"বেঁচে উঠতে পারে আবার," সান্ত্বনা দিয়ে মার্থা খালা বললেন। "চল এখন ডিনার খেতে। সন্ধের আগে তোর খালু বাড়ি আসছেন না। পনি, টেবিলটা ঠিকঠাক কর।"

"করছি। এমিল, বলো দেখি কি রান্না হয়েছে?"

"বলতে পারলাম না," সে বললো।

"তোমার সবচেয়ে পছন্দ কোন খাবার?"

হ্যাম-দেয়া ম্যাকারনি চিজ।"

"আমরা এখন সেটাই খাবো।"

গতোকাল ডিনারে ঠিক এই খাবারই খেয়েছিলো এমিল। কিন্তু এর মধ্যে এতো কিছু ঘটেছে যে এমিলের মনে হলো যেন এক সপ্তাহ আগে নয়স্টড্টে মা'র সাথে বসে এ খাবার খেয়েছিলো। অবশ্য সপ্তাহে সাতদিন ধরে এ খাবার খেতে তার আপত্তি নেই। তাই এমন গ্রোগ্রাসে খাবার গিলতে লাগলো যেন সে মিঃ গ্রুন্ডআইস-মুলার-কিস্‌লিং।

ডিনারের পর এমিল আর পনি রাস্তায় বেরিয়ে এলো। পনির ঝকঝকে নতুন সাইকেলটায় এমিল একটু চড়তে চায়। নানী একটু বিশ্রাম করার জন্য সোফায় শুলেন। মার্থা-খালা রান্নাঘরে গেলেন তাঁর বিখ্যাত আপেল-কেক সেঁকতে।

সাইকেলে চেপে শুমান স্ট্রীটের এমাথা-ওমাথা চক্কর দিয়ে চললো এমিল। পেছনে সিটটা ধরে দৌড়ে চললো পনি। তার ভয়—এমিল পড়ে যেতে পারে। তারপর এমিল দাঁড়িয়ে পনিকে নানা কায়দায় সাইকেলে ঘুরপাক খেতে দেখতে লাগলো।

তারপর এক পুলিশ কাছে এসে তাদের বললেন, "তোমরা কেউ বলতে পারো হেইমবোল্ডদের ফ্ল্যাটটা কোথায়? সেটার নম্বর কি ১৫?"

"হ্যাঁ—১৫ নম্বর," পনি বললো। "আমি পনি হেইমবোল্ড। এক মিনিট। চলুন আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।" বাড়ির মাটির নিচেকার তলায় তাড়াতাড়ি সে সাইকেলটা রেখে আসতে গেলো।

"কোনো গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?" এমিল প্রশ্ন করলো। সার্জেন্ট ইয়েশকে-এর ব্যাপারটা তখনো সে ভুলতে পারে নি। পুলিশটি বললেন, "আরে, না—না। ঠিক তার উল্টো। তোমার নাম কি এমিল টিশবাইন?

এমিল মাথা হেলালো।

"তাহলে তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

পনি ফিরে এসে শেষের কথাটা শুনে বললো, "কি ব্যাপার? কারো জন্মদিন নাকি?"

কিন্তু পুলিশটি আর বেশি কিছু জানালেন না তাদের। নিঃশব্দে সিঁড়ি ভেঙে উপরে এলো তারা। মার্থা খালা দরোজা খুলে বসবার ঘরে নিয়ে এলেন তাদের। ততক্ষণে নানীর ঘুম ভেঙে গেছে। বেশ কৌতূহল নিয়ে উঠে বসলেন তিনি। এমিল আর পনি টেবিলের পাশে দাঁড়ালো। ওরা দু'জনে খুব ব্যগ্র আর উৎসুক।

পুলিশ বললেন, "ব্যাপারটা এই। এমিল টিশবাইনের কৃতিত্বে আজ সকালে যে চোরটা ধরা পড়েছে গত মাসে সে হ্যানোভারে বড় একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করেছে বলে সনাক্ত করা গেছে। আমরাও ওকে খুঁজছিলাম কিছুদিন থেকে। সে এখন সবকিছু স্বীকার করেছে। আর বেশির ভাগ টাকাই তার কোটের লাইনিং-এর সেলাইয়ের ভেতর থেকে পাওয়া গেছে। সবগুলো একশো পাউন্ডের নোট।

"কি আশ্চর্য!" চিৎকার করে উঠলো এমিল।

"পনেরো দিন আগে চোরটাকে ধরার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষ একটা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন," পুলিশটি বলে চললেন। "তুমিই তাকে ধরেছো," বেশ অর্থপূর্ণভাবে মাথা হেলিয়ে তিনি এমিলকে বললেন। "পুরস্কারটা তাই তোমারই প্রাপ্য। সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট আমাকে বলেছেন তোমাকে তাঁর অভিনন্দন জানাতে। আর তোমার সাহস ও উদ্যমের এমন পুরস্কার দেখে খুব খুশি হয়েছেন তিনি।

এমিল সামান্য ঝুঁকে অভিবাদন জানালো। আর কি করবে কিছুই ভেবে পেলো না সে।

পুলিশটি তারপর পকেট থেকে একতাড়া কড়কড়ে নোট বের করে টেবিলের উপর গুনতে লাগলেন। মার্থা-খালাও সেদিকে চেয়ে থাকলেন আর গুনতে লাগলেন সঙ্গে সঙ্গে।

"পঞ্চাশ পাউন্ড," পুলিশটি শেষ নোট গুনে নিতে নিতে মার্থা-খালা বিড়বিড় করে বললেন।

"কি কাণ্ড!" অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো পনি।

নানীই পুলিশের রশিদে সই করে দিলেন। পুলিশটি চলে যাবার আগে মার্থা-খালা তাঁকে এক গ্লাস চেরী-ব্রান্ডি এনে দিলেন খালুর ভাঁড়ার থেকে।

এমিল সোফায় নানীর পাশে বসে রইলো। তার মুখে রা' নেই। নানী জড়িয়ে ধরলেন তাকে হাত দিয়ে।

"বিশ্বাসই করতে পারছি না ব্যাপারটা," মাথা নাড়তে নাড়তে নানী বললেন, "সত্যিই বিশ্বাস করতে পারছি না।"

পনি একটা চেয়ারে উঠে দাঁড়ালো। সে অর্কেস্ট্রা পরিচালানার ভান করছে এমন ভাবে হাত নাড়তে লাগলো। "এখন আমরা নেমন্তন্ন করবো আর সব ছেলেদের চা-য়ে-তে"! সে গেয়ে উঠলো।

"হ্যাঁ, নেমন্তন্ন করবো আমরা।" অবশেষে এমিল কথা বলতে পারলো। "কিন্তু সবচেয়ে আগে—ওঃ, কি মজা!—আমি পারি, পারি না কি? মা-ও বার্লিনে চলে আসুক তাহলে।"

মিসেস টিশবাইনকে আমন্ত্রণ

পরদিন খুব ভোরে মিসেস টিশবাইনের বাড়িতে এসে নয়স্টড্টের রুটিওয়ালার স্ত্রী মিসেস উইর্থ কলিং বেল টিপলেন।

দরোজা খুলে গেলে তিনি বললেন, "গুডমর্নিং মিসেস টিশবাইন্, কেমন আছেন?"

এমিলের মা উত্তরে বললেন, "গুডমর্নিং মিসেস উইর্থ। ভারী দুশ্চিন্তায় আছি। ছেলেটা যাবার পর এখনো কোনো খবর পেলাম না। বেল বাজলে প্রত্যেকবারই ভাবি এই বুঝি ডাকপিয়ন এলো। কিন্তু পিয়নের দেখা নেই। আপনি কি কোনো কাজে এসেছেন?"

"না—না," রুটিওয়ালার স্ত্রী বললেন। "আমি আপনাকে একটা খবর দিতে এসেছি।"

"তাই নাকি ? ধন্যবাদ।"

"খবরটা এমিল পাঠিয়েছে। সে আপনাকে তার ভালোবাসা পাঠিয়েছে আর—"

"হায় খোদা! তার কিছু হয়েছে নাকি ? কোথায় সে? আপনি কি করে খবর পেলেন? খবরটা কি ?" মিসেস টিশবাইন এমন অধৈর্য হয়ে পড়লেন যে খবরটা পুরো শোনার তরসইলো না তাঁর।

মিসেস উইর্থ প্রবোধ দিয়ে বললেন, "চিন্তার কিছু নেই। এমিল ভলোই আছে। কিন্তু খবরটা বিশ্বাস করবেন তো ? সে এক ব্যাংক-চোরকে ধরেছে। তাকে ধরবার জন্য একটা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিলো—এমিল সেটা পেয়েছে। পঞ্চাশ পাউন্ড। কেমন লাগছে আপনার? তারা চায় দুপুরের ট্রেনে আপনি বার্লিন যান।"

"আমাদের দোকানে আপনার বোন মিসেস হেইমবোল্ড ফোন করে আমাকে বললেন আপনাকে খবরটা দিতে। এমিল নিজেও আমার সাথে কথা বলেছে। তারা চায় আপনি এক্ষুনি চলে যান—আজকেই। আপনি যেতে পারবেন তো? এমিল এখন অনেক টাকা পেয়েছে।"

"হ্যাঁ, তা যেতে পারি," মিসেস টিশবাইন অস্পষ্টভাবে উত্তর দিলেন। সবকিছুই কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে। "পঞ্চাশ পাউন্ড ? চোর ধরার জন্য? কেন যে সে অমন একটা কাণ্ড করতে গেলো? মাঝে মাঝে এমন সব বোকামি করে বসে সে?"

"এবার কিন্তু বোকার মতো কাজ করে নি সে। পঞ্চাশ পাউন্ড মানে অনেক টাকা" মিসেস উইর্থ বললেন।

"বার বার টাকার কথা বলবেন না," বিরক্ত হয়ে বললেন মিসেস টিশবাইন।

"ছুটির সময় এর চেয়েও খারাপ কিছু ঘটতে পারতো। আপনি বার্লিন যাচ্ছেন তো ?"

"হ্যাঁ, অবশ্যই যাবো আমি। এমিলকে না দেখা পর্যন্ত এখন আর আমার এক মুহূর্তেরও শান্তি নেই।"

"আপনার যাত্রা শুভ হোক। অনর্থক আজে-বাজে চিন্তা করবেন না।"

"ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ, মিসেস উইর্থ," মিসেস টিশবাইন বললেন। তারপর দরোজা বন্ধ করে বিহ্বলভাবে ধীরে ধীরে মাথা নাড়াতে লাগলেন তিনি।

সেদিন বিকেলে বার্লিনে যাবার ট্রেনে উঠে আরো বড়ো রকমের বিস্ময়ের সম্মুখীন হলেন মিসেস টিশবাইন। খুব নার্ভাস আর অধীর হয়ে ছটফট করছিলেন তিনি। বার বার তাকাচ্ছিলেন কামরার চারদিকে আর জানালার বাইরে। পেছনে ছুটে পালিয়ে যাওয়া টেলিগ্রাফ পোস্টগুলো গুনতে চেষ্টা করলেন তিনি। তাঁর মনে হচ্ছিলো ট্রেনটা খুব আস্তে চলছে। ইচ্ছে হচ্ছিলো তাঁর নেমে ঠেলতে। তাঁর সামনে এক ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন। এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে হঠাৎ খবরের কাগজের এক জায়গায় চোখ পড়লো তাঁর। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "একি ব্যাপার!" ভদ্রলোকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন তিনি কাগজটা। তিনি ভাবলেন ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছেন।

মিসেস টিশবাইন চিৎকার করে বললেন, "এই যে, এখানে। দেখুন। এমিল! আমার ছেলে।" প্রথম পাতায় একটা ফটোতে আঙুল রাখলেন তিনি।

"সত্যি, তাই নাকি?" স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কৌতূহলী হয়ে ভদ্রলোক বললেন। "আপনি এই টিশবাইন ছেলেটির মা? কি আশ্চর্য ব্যাপার! মিসেস টিশবাইন, আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।"

"কি যে বলেন। কি যে বলেন!" অন্যমনস্কভাবে বললেন মিসেস টিশবাইন। ততক্ষণে তিনি খবরের কাগজের অক্ষরগুলোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। সেখানে প্রথমেই বড় বড় অক্ষরে লেখা ঃ

ক্ষুদে গোয়েন্দার কৃতিত্ব
বার্লিনের ১০০ ছেলের চোর তাড়া।

তারপর এমিলের নয়স্টড্‌ট থেকে বার্লিনে পুলিশের হেডকোয়ার্টার পর্যন্ত পৌঁছার চাঞ্চল্যকর বিবরণ। পড়তে পড়তে মিসেস টিশবাইনের মুখ একবার কালো হয়ে গেলো। তাঁর হাতে কাগজটা এমনভাবে কাঁপতে লাগলো যেন সেখানে ঝড় বইছে। আসলে কিন্তু দু'টো দরোজাই ভালো করে বন্ধ। তাঁর শেষ করা পর্যন্ত ভদ্রলোকের সবুর সইছিলো না। কিন্তু এমিলের গল্পের প্রথম পাতাটা প্রায় ঠাসা—ঠিক মধ্যিখানে তার ছবি—সমস্তটা পড়তে অনেক সময় লাগলো তার মার।

অবশেষে কাগজটা নামিয়ে রেখে তিনি বললেন, "একলা বেরুতে পারলেই এরকম একটা কিছু সে বাধিয়ে বসবেই।" তাঁর গলার স্বর শুনে মনে হলো তিনি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছেন। "যাবার সময় বার বার বলেছি তাকে নোটগুলোর দিকে ভালো করে নজর রাখতে। বুঝতে পারছি না কেমন করে এটা ঘটলো। সে তো জানে আমাদের আছে কত কম! আর সে কিনা পুরো সাতটা পাউন্ড চুরি করতে দিলো তার পকেট থেকে!"

ভদ্রলোক বললেন, "এটা তো সোজা কথা। ক্লান্ত হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। চোরটা হয়তো তাকে হিপ্‌নোটাইজ করেছিলো। এরকম ঘটনা আরো ঘটেছে আগে। কিন্তু যেভাবে ছেলের দল শেষ পর্যন্ত খুঁজেছে সেটাই আশ্চর্য। আমার মতে এটা একটা জিনিয়াসের কাজ। অপূর্ব। এরকম কাজের তুলনা হয় না।

"আপনার কথাটাই ঠিক," প্রশংসায় প্রীত হয়ে মিসেস টিশবাইন বললেন। "এমিল বুদ্ধিমান ছেলে। আর সে খাটেও খুব। প্রতিবার সে পরীক্ষায় প্রথম হয়। কিন্তু যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটতো? ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার। অবশ্য সবইতো এখন চুকে-বুকে গেছে। আর সবকিছুই ভালোয়-ভালোয় শেষ হয়েছে। এটা ঠিক, এরপর তাকে আর কখনো একলা খেতে দিচ্ছিনে। তার কি হচ্ছে এটা ভাবতে ভাবতেই ভয়ে মরে যাবো আমি।"

"এই ফটোটার মতোই তার চেহারা তো ? ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ। হুবহু এরকম। সুন্দর চেহারা না ওর?"

ভদ্রলোক বললেন, "হ্যাঁ। সত্যিই সুন্দর সে। চমৎকার দেখাচ্ছে তাকে। আমি নিশ্চিত—বড় হলেও তার চেহারা এমনি সুন্দর থাকবে।"

"ছবি তোলার সময় তার আরো ঠিকঠাক হয়ে নেয়া উচিত ছিলো," তার মা বিরক্তির সুরে বিড়বিড় করতে লাগলেন। "কোটটা তার একেবারে কুঁচকে গেছে। সব সময় বলি তাকে বসবার আগে বোতাম খুলে ফেলতে। কিন্তু সে থোড়াই পাত্তা দেয় এতে।"

"যদি এটাই তার সবচেয়ে দোষের হয়—" বলতে বলতে ভদ্রলোক হেসে ফেললেন।

"না-না সে ভালো ছেলে। সত্যিই তার কোনো খারাপ দোষ-টোষ নেই।" বলতে বলতে তাঁর গলা ধরে এলো। নাক ঝাড়তে হলো তাঁকে।

পরের স্টেশনে ভদ্রলোক নেমে গেলেন। কাগজটা তিনি মিসেস টিশবাইনের জন্য রেখে গেলেন। ট্রেনটা ফ্রিয়েড্রিশ স্টেশনে না পৌঁছা পর্যন্ত তিনি বার বার শুধু এমিলের কাহিনীটা পড়লেন। সব মিলিয়ে এগারো বার পড়লেন তিনি।

ইস্টিশানে এমিল তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলো। মা আসছেন বলে সবচেয়ে ভালো স্যুটটাই সে পরে এসেছে। তাঁকে জড়িয়ে ধরে এমিল বললো, "ব্যাপারটা কেমন লাগছে মা ?"

"এটা নিয়ে বড়াই করতে শুরু করিস না," মা তাকে সাবধান করে দিলেন।

"আহা, মিসেস টিশবাইন," মায়ের হাত জড়িয়ে ধরে দুষ্টুমি করে বললো এমিল, "আপনি এসেছেন বলে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি।"

"চোর ধরতে গিয়ে তোর স্যুটের তো তেমন কোনো উন্নতি হয় নি," মিসেস টিশবাইন মন্তব্য করলেন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠে রাগের কোনো প্রকাশ নেই।

"তুমি যদি কিছু মনে না করো তাহলে একটা নতুন স্যুট কিনবো।"

"কোনখান থেকে শুনি ?"

"কয়েকটা দোকান গুস্তভ, প্রফেসার আর আমাকে স্যুট দিতে চায়।" এমিল বললো, "তাহলে তারা কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে পারে যে, আমাদের গোয়েন্দা-দল সব স্যুট তাদের কাছ থেকে করায়।"

"তাই নাকি?" তার মা বললেন।

"কিন্তু আমরা নেবো না," একটু ভারিক্কি চালে এমিল বললো। "তারা অবশ্য বলেছে বাজে পুরোনো স্যুটের বদলে একটা করে নতুন ফুটবল নিতে পারি আমরা। কিন্তু আমাদের মনে হয় ওদের এই বাড়াবাড়ির কোন অর্থ নেই। বড়রা এ রকম ব্যাপার পছন্দ করতে পারে, কিন্তু তাদের চেয়ে আমাদের বিচার-বুদ্ধি অনেক বেশি।"

"সাবাশ!" বলে উঠলেন তার মা।

"খালু টাকাটা বাক্সে চাবি দিয়ে রেখেছেন। পঞ্চাশ পাউন্ড! বেশ মজার ব্যাপার, তাই না মা– এটা দিয়ে প্রথমে তোমার জন্য একটা ইলেকট্রিক চুল শুকোবার যন্ত্র কিনবো আর একটা ফার লাগানো ভালো শীতের কোট। আমার জন্য কি নেবো এখনো কিছু ভাবি নি। হয়তো একটা ফুটবল। নয়তো একটা ক্যামেরা। থাকগে পরে সেটা দেখা যাবে।"

"নোটগুলো ব্যাঙ্কে জমা দেয়াই ভালো। এটা যে খারাপ এ বিষয়ে এখনো নিশ্চিত হতে পারিনি আমি", তার মা চিন্তান্বিত কণ্ঠে বললেন। "এটার জন্য পরে খুশি হবি তুই।"

"যাই হোকনা কেন চুল শুকোবার যন্ত্র আর একটা ফার কোট কিনতেই হবে," এমিল জোরগলায় বললো। "তারপর তোমার ইচ্ছে হলে বাকিটা ব্যাংকে রেখে দেয়া যাবে।"

"পরে এ নিয়ে আলোচনা করবো," এমিলের হাতে চাপ দিয়ে মা বললেন।

"জানো, সব কাগজে আমার ছবি বেরিয়েছে!" এমিল বললো, "আর আমাদের নিয়ে অনেক কিছু লিখেছে।"

"ট্রেনে একটা কাগজ পড়েছি," তার মা বললেন। "প্রথমে তো ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। এমিল সত্যি করে বল, তোর কিছু হয়নি তো? তুই ভালো আছিস তো?"

"খুব ভালো আছি। চমৎকার ব্যাপার সেটা। পরে সব কথা বলবো। কিন্তু আগে অন্য সব ছেলের সাথে দেখা করতে হবে তোমাকে।

"কোথায় আছে ওরা ?"

"মার্থা-খালার বাড়িতে। বড়ো একটা আপেল-কেক বানিয়েছেন তিনি গতোকাল। আজ বিকেলে ছেলেদের নেমন্তন্ন করেছেন তিনি। ওরা সবাই সেখানে এখন। বাজি রেখে বলতে পারি, দারুণ হৈ চৈ চলছে এখন সেখানে।"

সত্যিই খুব হৈ-হল্লা করে একটা পার্টি হচ্ছিলো হেইমবোল্ডদের বাড়িতে। সেখানে আছে গুস্তভ, প্রফেসার, ক্রুম, মিটলাররা দু'ভাই, জেরোল্ড, ফ্রেডারিক দ্য ফার্স্ট, ট্রাউট, বাচ্চা টুইসডে এবং আরো অনেকে। সবার চেয়ার জোটে নি। গরম চকোলেটের একটা বড় জাগ নিয়ে পানি হুটচেন এখান থেকে ওখানে ছুটোছুটি করছিলো। আর মার্থা-খালার আপেল কেকটা যেন স্বপ্ন। নানী সোফায় বসে সবার দিকে চেয়ে মৃদু হাসছিলেন। তাঁর বয়স যেন দশ বছর কমে গেছে।

এমিল আর তার মা এলে ছেলেরা সবাই চিৎকার করে অভ্যর্থনা জানালো। এমিল ছেলেদের পরিচয় করিয়ে দিলো। মিসেস টিশবাইন প্রত্যেকের সাথে হ্যাণ্ডশেক করলেন আর এমিলকে সাহায্য করেছে বলে ধন্যবাদ দিলেন।

এমিল বললো, "আমি প্রস্তাব করছি অই স্যুট কিংবা ফুটবল কিছুই আমরা নেবো না। শুধু প্রচারের জন্যই তারা দিতে চাইছে। তাই না ?

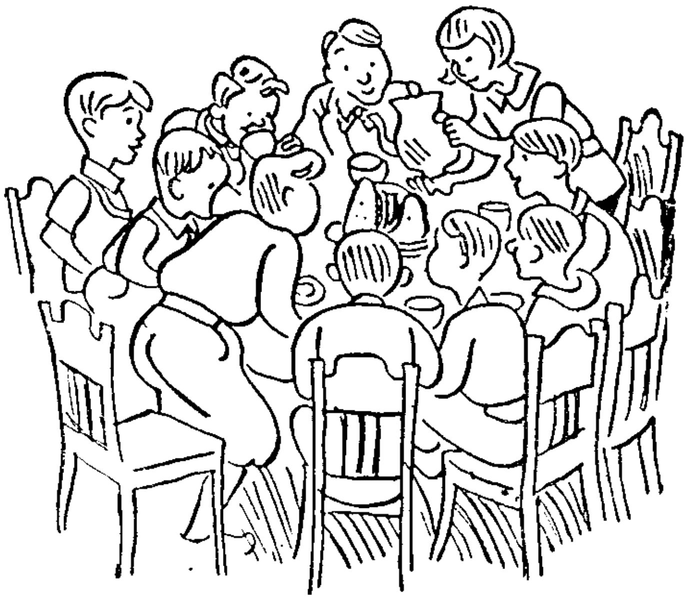

"হ্যাঁ, আমরা তাই ভাবছি," বলে গুস্তভ এমন জোরে তার ভেঁপু বাজালো যে মার্থা-খালার ফুলদানিগুলো থর থর করে কেঁপে উঠলো।

তারপর সোনালি কিনারওয়ালা কাপে চামচ ঠুকে নানী বললেন ঃ "শোনো গো ছেলেরা। আমার একটা কথা আছে। না, তোমরা যে কি রকম চালাক সে কথা বলছি না আমি। এতো লোক তোমাদের চালাক বলেছে যে মাথা বিগড়ে দেবার জন্য সেটা যথেষ্ট। আমি তা করবো না। না, আমি তা করবো না।

প্রত্যেকে চুপ হয়ে গেলো। এমন কি খাওয়াও বন্ধ করে দিলো।

"শ' খানেক ছেলে মিলে একজন লোককে ধরা খুব একটা চালাকির কিছু নয়। আশা করি তোমরা কিছু মনে করছো না।" তিনি সবার দিকে তাকিয়ে হাসলেন মধুরভাবে। "কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন একজন আছে মিঃ গ্রুন্ড আইসের পিছু নেবার যার খুব ইচ্ছে ছিলো। লিফট্‌বয়ের ইউনিফর্ম পরে সাজতেও তার খুব পছন্দ হতো। কিন্তু সে বাড়িতে থাকার কথা দিয়েছিলো। আর সে সত্যিই ছিলো।

সবাই টুইসডে'র দিকে তাকালো। লজ্জায় তার মুখ একদম লাল হয়ে গেছে।

"হ্যাঁ, বাচ্চা টুইসডে।" ওর দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে নানী বললেন। "সে পুরো দু'দিন টেলিফোনের পাশে বসেছিলো ঘরের মধ্যে। এটা তার ডিউটি ছিলো বলেই। খুব একটা মজাও ছিলো না ঐ কাজে। কিন্তু আমি বলবো এটাই সবেচেয়ে বেশি প্রশংসার। আশা করি, তার উদাহরণ দেখে তোমরা শিখবে। প্রস্তাব করছি আমি, তোমরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে টুইসডেকে থ্রি চীয়ার্স দাও।"

ছেলের দল অমনি সাগ্রহে লাফিয়ে উঠলো। খুব বেশি হৈ চৈ করার জন্য পনি তার গালের দু'পাশে হাত রাখলো। মার্থা-খালা আর এমিলের মা বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে। তাঁরাও একযোগে চিৎকার করে উঠলেন, "থ্রি চীয়ার্স ফর লিট্‌ল্ টুইসডে---হিপ্ হিপ্ হুররে।"

তারপর তারা সবাই বসে পড়লো। বাচ্চা টুইসডে একটা গভীর নিশ্বাস টেনে বললো, "অনেক ধন্যবাদ। এটা তেমন কিছু নয়। এ নিয়ে আর কিছু বলবেন না প্লিজ।"

"আর কার চকোলেট চাই?" বড় জাগটা হাতে নিয়ে পনি চেচিয়ে উঠলো। "এমিলের শুভ কামনা করে এখন আমরা চকোলেট পান করবো।"

শেখার কথা হচ্ছে—

পার্টি শেষ হতে হতে বেশ বিকেল হয়ে গেলো। ছেলেরা যাবার আগে এমিল কথা দিলো পনি আর প্রফেসরাকে পরদিন বিকেলে সে চা খাওয়াতে নিয়ে যাবে। তার কিছুক্ষণ পরে মিঃ হেইমবোল্ড বাড়ি ফিরলেন। সবাই একসাথে সাপার খেয়ে নিলো। খাওয়া শেষ হলে ক্যাশ বাক্স খুলে পঞ্চাশ পাউন্ডের নোটগুলো বের করে মিসেস টিশবাইনকে দিলেন তিনি।

"আমি হলে ব্যাংকে জমা দিতাম," তাঁকে বললেন তিনি।

"আমিও তাই ভাবছি," এমিলের মা বললেন।

"কখনো না," এমিল চেঁচিয়ে উঠলো। "তাতে আমার একটুও ভালো লাগবে না। আমি মাকে একটা ইলেকট্রিক চুল শুকোবার যন্ত্র আর ফার কোট কিনে দিতে চাই। এই পঞ্চাশ পাউন্ড তো আমার। আমাকেই দেয়া হয়েছে। আমার খুশিমতো খরচ করতে পারি না?"

"কক্ষনো পারো না," তার খালু বলে উঠলেন। "তুমি একদম বাচ্চা। এটা ছুঁতে পাবে না তুমি। তোমার মা-ই ঠিক করবেন টাকাটা দিয়ে কি করা হবে।" এমিল উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

পনি বললো, "বাবা, তুমি বোকার মতো কথা বলছো। দেখতে পাচ্ছোনা, এমিল তার মাকে উপহার দিতে চায়। বড়রা মাঝে মাঝে এমন বোকামি করে----।"

"চুল শুকোবার যন্ত্র আর কোট ওকে দিতে হবেই," নানী বললেন। "কিন্তু বাকিটা ব্যাংকে রাখতে তো তোর আপত্তি নেই?"

"না--মোটেই না," এমিল তাঁদের দিকে ফিরে বললো। "মা যদি তাই বলেন তা হবে।"

"বেশ বেশ। বাচ্চা লাখপতি। আমি কথা দিচ্ছি।"

"কাল সকালেই কেনা-কাটা করতে যাবো আমরা," এমিল সন্তুষ্ট হয়ে বললো। "তুমিও যাবে পনি, যাবে তো?"

"নিশ্চয়ই যাবো," ওর খালাতো বোন বললো। "তোমরা দোকানে যাবে আর বাড়িতে বসে আমি মাছি ধরবো নাকি? খালার জন্য চুল শুকোবার যন্ত্রটা কেনার পর তোমার নিজের জন্যও কিছু কিনতে হবে। একটা বাইক কিনলে কেমন হয়? তা হলে চড়ে চড়ে আমারটা ভাংগবেনা তুমি।"

উদ্বিগ্ন হয়ে মা বললেন, "পনির বাইকটা ভেঙ্গেছিস নাকি?" "মোটেই না। আমি শুধু সিটটা উঁচু করে দিয়েছিলাম একটু। সেটা খুব নিচু ছিলো আমার জন্য। সাইকেলে রেস-দেনেওয়ালাদের মতো হ্যান্ডেলের উপর ঝুঁকে থাকতে পনি ভালোবাসে।

"আবার যদি সাইকেল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করো তাহলে তোমার সাথে কথা বলবো না বলে দিলাম," পনি চেঁচিয়ে বললো।

"তুমি যদি শুকনো হাড় আর মেয়ে না হতে তাহলে ভালো করে শিক্ষা দিয়ে দিতাম। তবে আজ তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবো না। আমার টাকা দিয়ে আমি কি কিনি না কিনি সেটা তোমার বলবার বিষয় নয়," বলে বেশ ভারিক্কি ভঙ্গিতে এমিল তার প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে রাখলো। নানী তাদের বাধা দিয়ে বললেন, "হয়েছে, হয়েছে। ঝগড়া করার সময় নয় এটা।" ব্যাপারটা সেখানেই চাপা পড়লো।

পরে মিঃ হেইমবোল্ড 'কুকুরটাকে বেড়াতে নিয়ে গেলেন'। আসলে তাদের কোনো কুকুর ছিলো না। কিন্তু পনির বাবা সন্ধ্যার সময় যখন এক গ্লাশ বিয়ার খেতে বেরুতেন পনি সব সময়ে বলতো 'কুকুরটাকে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি'।

নানী, এমিল, পনি আর তাদের মা ও খালা গতোকালকের রোমাঞ্চকর ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

অবশেষে মার্থা-খালা বললেন, "কষ্ট করলে কিছু না কিছু লাভ হবেই।"

"আমি একটা শিক্ষা পেলাম," এমিল বললো। "অচেনা লোককে কখনো বিশ্বাস করতে নেই।"

এমিলের মা বললেন, "আমি বুঝলাম, ছেলেদের একলা যেতে দিতে নেই কখনো।"

'যতোসব বাজে কথা," নানী গজগজ করে বললেন। "তোমরা সবাই ভুল করছো, ভুল করছো।"

একটা চেয়ারে বসে সেটা ঘরময় টানতে টানতে পনি বললো, "কোনো অর্থ নেই এর, কোনো অর্থ নেই এর, কোনো অর্থ নেই এর।"

"তাহলে যা ঘটেছে সেখান থেকে শেখার কিছু নেই, তুই এটা বলতে চাস?" মার্থা-খালা বললেন।

"আছে, আছে," বললেন নানী।

"কী তাহলে?" সবাই একসাথে প্রশ্ন করলো এবার। "টাকা সব সময়ে মানি-অর্ডারে পাঠানো উচিত," হাসতে হাসতে নানী বললেন।

"থ্রি চীয়ার্স!" পনি চীৎকার দিয়ে উঠলো। তারপর চেয়ারটা ঘসে ঘসে টেনে বসবার ঘরের দরোজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো।।

এটি সেই বইটিরই একটি সম্পূর্ণ নতুন অনুবাদ –যেটি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের অনন্ত আনন্দের খনি হয়ে আছে।

এই বইটি একটি গোয়েন্দা-কাহিনী। এমিল দুর্বৃত্তের শিকার। একা রেলের কামরায় জীবনের প্রথম ভ্রমণে চুরি হলো তার টাকা। নোটগুলি সে নিয়ে যাচ্ছিলো বার্লিনে তার নানীর কাছে– মা'র অনেক পরিশ্রমের সযত্ন-সঞ্চিত টাকা। তার সমবয়সী একদল ছেলে তাকে সাহায্য করার জন্য এলো এগিয়ে। চোরের পিছু নিলো তারা, ধরলো এবং খুলে দিলো চোরের ভদ্রলোকের মুখোশ। যতোই কাহিনী এগোয় ততই রহস্য হয়ে ওঠে ঘনীভূত। চমৎকার পরিকল্পনা করে ছেলেরা, উপস্থিত বুদ্ধির তীক্ষ্ণ ব্যবহার করে অত্যন্ত সহজে অথচ আটঘাট বেঁধে ধরে ফেলে তারা চোরকে। প্রত্যেকটি চরিত্রই সুন্দরভাবে উপস্থাপিত। যেন ছেলেদের কাছে একেবারে চেনা। ঘটনার গতি মনোরম। পাঠকের বিশ্বাস না করে উপায় নেই কোনোকিছু– সেই দীর্ঘ ভ্রমণের জন্য পোশাক বাছাই থেকে শুরু করে সবশেষে অপ্রত্যাশিত পুরস্কার পর্যন্ত সবই আশ্চর্য ও সহজভাবে বর্ণিত।

বেশ মজার সাথে বইখানি সবাই পড়ে। আট বছরের ক্ষুদে পাঠকও বেশ আগ্রহ নিয়ে এগোতে পারে আর তেরো-চৌদ্দ বছরের ছেলে-মেয়েদের তো কথাই নেই।

সেকায়েপ

সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (SEQAEP) এর পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য মুদ্রিত।

বিক্রির জন্য নয়